বিশ্ব সুন্দরী

উত্তরা ১৩ নাম্বার সেক্টরের লেকসংলগ্ন পার্কটিতে সকাল-বিকাল লোকজন হাটতে আসেন। পার্ক বলতে যা বোঝায় এটি আসলে তা নয়, এটি একটি অপূর্ব সুন্দর কানন। লেকের কোল ঘেষে দাড়িয়ে আছে উচু ঝাউগাছের সারি। পড়ন্ত বিকালে ঝাউয়ের ডালে ডালে বসে থাকা সাদা বকগুলো দেখলে মনে হবে, গাছগুলো ফুলে ফুলে সাদা। পার্কের মাঝ বরাবর ৫৫০ মিটারের পায়ে চলার একটি পাকা রাস্তা। এর উত্তর প্রান্তে সোনারগাও জনপথ ও দক্ষিণ প্রান্তে গাউসুল আজম এভিনিউ। রাস্তার স্থানে স্থানে দূরত্বের সংখ্যা লেখা আছে। পায়ে চলার পথটির পাশে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের গাছ, সারা বছর রঙ-বেরঙের ফুলের সমারোহ। সময়ে সময়ে রঙ বদলায়। মানুষজন যখন সারিবদ্ধ হয়ে এই রাস্তা দিয়ে হাটেন তখন দেখলে মনে হবে এ যেন এক পাহাড়ি প্রস্রবন বুক ভরা জলরাশি নিয়ে ধীরগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে। একজন উদ্ভিদ প্রেমিকের অক্লান্ত চেষ্টায় এ পার্কটি গড়ে উঠেছে। স্থানীয় এক সংগঠনের আমন্ত্রণে গত ভাদ্রে পূর্ণিমা রাতে জোছনাস্নাত বাগানের দৃশ্য উপভোগ করতে দলে দলে লোকজন জড়ো হয়েছিল। এই পৃথিবীকে গাছপালা দ্বারা যে কতো আকর্ষণীয় করে সাজানো যায় এই পার্কটি তার

প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনে যতো ক্লান্তি, বিষণ্নতা বা হতাশা থাকুক না কেন, পার্কে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেহমনে প্রশান্তি নেমে আসবে, তখন কবি গুরুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করবে মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।

যারা নিয়মিত পার্কে আসেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক প্রবীণ দম্পতি। প্রবীণ লোকটি শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত, শ্বেত বসনে, দক্ষিণ হস্তে ছড়ি নিয়ে হাটছেন আর তার সঙ্গিনী পশ্চাতে পশ্চাতে। সঙ্গিনী প্রায়ই হাটতে হাটতে পেছনে পড়ে যান তখন স্বামী দাড়িয়ে থেকে তাকে মিলিত হতে সাহায্য করেন। এ দৃশ্য সবাই উপভোগ করে। লেকের পাড়ে ঝাউতলায় বিশ্রামের জন্য গুটিকয়েক বাশের মাচা পাতা আছে। বয়স্করা ওখানে বসে গল্প করেন। তিনটি মাচা স্থায়ীভাবে একদল তরুণ-তরুণীর দখলে চলে গেছে। তারা কাছের ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রী। প্রায় দেখা যায় তাদের মাঝে বসে ওই শুভ্র দম্পতি। পুরুষটি তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলছেন। তরুণ-তরুণীরা তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনছে। কথার ফাকে বৃদ্ধটি হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন, আমি ছিলাম পাক আর্মির একজন জাদরেল কর্নেল, আমি ইনডিয়ার বিরুদ্ধে খেমকেরাম সেক্টরে যুদ্ধ করেছি। এরপর যুদ্ধের বর্ণনা শুরু করেন। ছেলেমেয়েরা মাঝে-মধ্যে হেসে ওঠে আবার কেউ কেউ হাতে তালিও দেয়। এরূপ দৃশ্য সময়ে সময়ে দেখা যেতো। ইতিমধ্যে এরা যুগলদের সঙ্গে দাদা-দাদির সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

একদিন তরুণ-তরুণীরা প্রবীণ দম্পতির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। দাদা-দাদির বৈবাহিক জীবনের কথা শুনবে তারা। হঠাত্ দাদা-দাদিকে আসতে দেখে তারা এগিয়ে নিয়ে এসে বিশেষ যত্ন সহকারে মাচায় বসায়। দাদা-দাদি মাচার ওপর আর তরুণ-তরুণীরা সামনে মাটিতে ঘাসের ওপর বসে। নীরবতা ভঙ্গ করে প্রবীণ লোকটি বললেন, আমাদের যখন বিয়ে হয়, তোমাদের দাদির বয়স তখন ১৬ বছর হবে, হাই স্কুলে পড়তো। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ঠিক বলিনি প্রাণেশ্বরী?

একজন বৃদ্ধ তার স্ত্রীকে প্রাণেশ্বরী সম্বোধন করায় ছেলেমেয়েরা উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। হাসি থামার পর প্রবীণ লোকটি বললেন যুদ্ধ ক্ষেত্র হতেও ওকে প্রাণেশ্বরী সম্বোধন করে পত্র লিখতাম। সেই পত্র আমাদের ছেলেমেয়েরাও পড়তো। প্রাণেশ্বরী হলো ওর ডাকনাম, আমি আদর করে রেখেছি, একান্ত আমার জন্য। বিবাহিত জীবনের ৫০ বছর অতিক্রম করে ফেলেছি, আজো ওকে প্রাণেশ্বরী ডাকি।

তখন একটি ছেলে প্রশ্ন করলো- আচ্ছা দাদু, আপনাদের এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবন কেমন কেটেছে?

ঝাউগাছের মাথার উপর বসা এক জোড়া বকপাখির দিকে চেয়ে দাদু বললেন, কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ শিরে।

হঠাত্ করে তরুণদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলো- আচ্ছা দাদু, এই যে আপনি এতোটা বছর একই মহিলাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে রাত কাটিয়েছেন, এতে কি, কখনো আপনার বিরক্তি লাগেনি?

দাদু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন - না, বিরক্তি লাগবে কেন? প্রতিটি রাতই মনে হয়েছে আমাদের বাসর রাত- কি ঠিক বলিনি প্রাণেশ্বরী? শুনে প্রাণেশ্বরী নড়ে চড়ে বসলেন।

ছাত্রদের থেকে আবার প্রশ্ন দাদু, দাদিকে দেখতে আপনার কেমন লাগে?

দাদু, দাদির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর দিলেন প্রাণেশ্বরী আমার কাছে বিশ্বসুন্দরী। উত্তর শুনে ছেলেমেয়েরা জোরে তালি দিতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্বরে স্লোগান দিতে লাগলো - প্রাণেশ্বরী জিন্দাবাদ- বিশ্বসুন্দরী জিন্দাবাদ। হতবাক হয়ে হাটা থামিয়ে অনেকে এই অভিনব দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলো। এদের মধ্য থেকে ইউনিভার্সিটির এক অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ছাত্রছাত্রীদের কাছে ছুটে এলেন। ধমকের স্বরে বলতে লাগলেন থামো তোমরা, মুরব্বিদের মশকরা করতে নেই। তাদের সম্মান করতে শেখো। প্রবীণযুগল বসা থেকে উঠে রাস্তা দিয়ে হাটতে লাগলেন। ছেলেদের কয়েকজন তাদের পার্কের গেট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলো।

এরপর। এরপর মানুষজন যথারীতি পার্কে হাটেন। বয়স্করা মাচায় বসে গল্প করেন। পাখিরা ঝাউ-এর ডালে খেলা করে। গাছে গাছে ফুল ফোটে। তরুণ-তরুণী মাচায় বসে আড্ডা মারে আর দাদু-দাদির প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তারা আর আসে না। এর জন্য তারা অবসরপ্রাপ্ত ওই

প্রফেসরকে দায়ী করে। দাদুর কতকগুলো অকপট উক্তি তাদের ভাবিয়ে তোলে। স্ত্রীকে প্রাণেশ্বরী সম্বোধন, প্রতিটি রাত বাসর রাত, স্বামী-স্ত্রীর সুখের তুলনা, কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ শিরে। আর সবচেয়ে অর্থবহ উক্তিটি হলো, স্বামীর চোখে স্ত্রী - বিশ্বসুন্দরী। উক্তিগুলোর মর্ম উদ্ধার করতে মাঝে-মধ্যে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়।

এভাবে দুমাস গত হতে চলছে হঠাত্ এক বিকালে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক পার্কে উপস্থিত হয়ে তরুণ-তরুণীদের জানালো, যে প্রবীণ দম্পতি তাদের সঙ্গে গল্প করতো, তারা তার জনক-জননী। দুমাস আগে তারা সিলেটের গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। বাবা ফিরে এসেছেন তবে একা। মা গ্রামের বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। এই কথা বলে লোকটি কেদে ফেললেন। ছেলেমেয়েরা মর্মাহত। চোখ মুছে ভদ্রলোক জানালেন, আগামীকাল তার বাসায় বাদআসর মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। মায়ের জন্য দোয়া করা হবে। মাহফিলে যোগ দিতে তাদের অনুরোধ করলেন। সেক্টরেই তার বাসা। এই বলে পকেট থেকে তার পরিচিতি কার্ড ছেলেমেয়েদের দিলেন। আরো বললেন, মার ইন্তেকালের পর হতে বাবা কথা বলা পছন্দ করেন না। তোমরা এলে তিনি খুশি হবেন।

বিশ্বসুন্দরীর তিরোধানের সংবাদ শুনে এরাও হতবাক।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

স্বপ্ন পুরুষ

দেরিতে হলেও অবশেষে আমার জীবনে প্রেম এলো। অফুরন্ত ভালোবাসার ভাণ্ডার নিয়ে যে এলো আমার জীবনে সে হলো ভাবীর মামাতো ভাই। আমার ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে ১৯৯২ সালে। একটা সময় তাকে আমি পছন্দ করতাম না চঞ্চলতার কারণে। কেন জানি মনে হতো তার মধ্যে গভীরতা কম। কৈশোরের একটা সময় সে আমার বড় বোনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। যদিও আমার বোনের কাছে এটা ছিল প্রেফ একটা খেলা। বড় বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর অনেকদিন সে আমাদের বাসায় আসেনি। চার বছর আগে থেকে আমাদের বাসায় তার আসা-যাওয়া আবার বেড়ে যায়।

সবাই বলে আমি খুব কঠিন, হিসেবি এবং যুক্তিবাদী মেয়ে। এতো গুণের কারণেই কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশতে পারিনি। প্রিয় বান্ধবীর বক্তব্য, এতো বছরেও কোনো ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বা প্রেম হয়নি। তাই আমার জীবনটা তার কাছে মরুভূমি মনে হয়। বান্ধবীর কথার উত্তরে বলতে পারিনি হৃদয়ের সব ভালোবাসা আমি শুধু একজনের জন্য সঞ্চিত করে রেখেছি, যাকে আমি বিশ্বাস করবো, যাকে আমি ভালোবাসবো। সে আমার জীবনে আসার আগে অতীতে বিভিন্নজনকে আমার ভালো লেগেছিল। ভালো লাগা আর ভালোবাসা তো এক বিষয় নয়।

২০০৪ সাল থেকে ওর চোখে আমি নিজেকে দেখতে লাগলাম। এক সময় সে আমাকে মোবাইলে মিস কল দেয়া শুরু করলো।

এক নববর্ষে তাকে আমি এসএমএস পাঠালাম। এরপর থেকে সেও এসএমএস দিতে লাগলো। মাঝে মধ্যে মোবাইলে কল দিয়ে কিছু অর্থহীন কথা বলতো। এভাবে অনেকদিন চলার পর একদিন রাতে তার সঙ্গে মোবাইলে কথা হলো। ওর সঙ্গে কথা বলতে আমার খারাপ লাগলো না। তার মনোবল বেড়ে গেল এবং আমরা প্রতিরাতে কথা বলতে লাগলাম। এক রাতে সে আমাকে তার ভালোবাসার কথা বললো। সঙ্গে

সঙ্গে আমার বুকের ভেতরে ভালো লাগার ঝড় উঠলো। মনে হলো সে আমার সেই স্বপ্ন পুরুষ যার জন্য আমি সব ভালোবাসা জমিয়ে রেখেছি। বিভিন্নভাবে তাকে পরীক্ষা করলাম এবং নিশ্চিত হলাম আমিও তাকে ভালোবাসি। কারো ভালোবাসা পেতে এবং তাকে ভালোবাসা দিতে যে এতো সুখ সে আমার জীবনে না এলে মোটেও জানতাম না। এক সময় বুঝতে পারলাম তাকে ছাড়া জীবন কাটানো আমার পক্ষে হয়তো অসম্ভব।

আমার বাসায় তার কথা বললাম। প্রতিক্রিয়ায় সবাই বললো, আমার মতো এমন যুক্তিবাদী মেয়ে কিভাবে তার প্রেমে পড়লাম। সবাই বোঝাতে চেষ্টা করলো, সে আমাকে সুখে রাখতে পারবে না। কারণ সে এখনো তার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাসার লোকজনের এসব কথা শোনার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খেলাম যখন বড় বোন বলতে লাগলো, সে আমাকে ভালোবাসে না বরং বড় বোনের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে পটিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আমার দুনিয়াটা যেন ওলট-পালট হয়ে গেল।

তার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া করতে গেলাম। সে আমাকে বোঝাতে সক্ষম হলো, বড় বোনের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল অল্প বয়সের অতি আবেগের ফল। তার একমাত্র ভালোবাসা আমি। আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম। কেননা আমার কাছে কিছুই না লুকিয়ে তার সব কথা আমার সঙ্গে শেয়ার করেছে সে। আমার বিশ্বাস আবার ফিরে এলো। আমাদের সম্পর্ককে আমি একটা সুযোগ দিতে চাই।

সর্বশেষ খবর হলো, এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই সে তার বাসায় আমাদের কথা বলবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আমাদের বিয়ে হবে। এদিকে আমি আল্লাহকে বারবার বলছি, সে যদি সত্যি সত্যি আমাকে ভালোবাসে এবং আমার প্রতি তার ভালোবাসায় যদি কোনো খাদ না থাকে তাহলেই যেন আমাদের বিয়েটা হয়। সবকিছু আমি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়েছি। তাকে না পাওয়ার ব্যথা হয়তো আমি সহ্য করতে পারবো। কিন্তু বিয়ের পর সে আমার সঙ্গে আছে কিন্তু পাশে নেই, এমনকি তার মনের অধিকার ১০০ ভাগ আমার নয়, এটা সহ্য করার মতো কঠিন মন আমার নেই।
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

সাইকেলই ভালো

গার্ল ফ্রেন্ডের চাইতে সাইকেল কেন ভালো।
সাইকেল নিয়ে আপনি সারা দিন ঘুরে বেড়াতে পারবেন আপনার পকেটের একটি টাকাও খরচ হবে না।
সাইকেল নিয়ে আপনি যখন তখন যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াতে পারবেন। আপনার ইচ্ছামতো যেভাবে খুশি একে বেকে ঘুরতে পারবেন সাইকেল কোনো প্রকার বাধা দেবে না।
সাইকেল কোনো রেস্টুরেন্টে যেতে বলবে না।
সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বের হওয়ার আগে মানিব্যাগের খবর নিতে হবে না।
সাইকেল নিয়ে বের হওয়ার আগে শেভ করতে হবে না।

এবার সবাই আমার সঙ্গে বলেন, আর না, আর না, গার্লফ্রেন্ড চাই না।

গার্ল ফ্রেন্ডের মরণ হোক, সাইকেল অমর হোক।

কচুক্ষেত, ঢাকা থেকে

সুপুরুষ

এ ঘটনাটি যতোটা মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী সম্ভবত আমি ততোটা করুণভাবে লিখতে পারবো না। এর মুখ্য চরিত্র আমার আপন না হলেও খুব কাছের আত্মীয়। তার নাম মামুন। কিন্তু সে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও এলাকার মানুষের কাছে সুপুরুষ নামে ব্যাপকভাবে পরিচিত। তার লম্বা চেহারা, গৌর গাত্রবর্ণ, উচ্চ শিক্ষা, সবার সঙ্গে বিনয়ী আচরণ ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাকে এই নামে সুখ্যাতি এনে দেয়। সে গরিব বিধবার একমাত্র সন্তান।
মামুন একজন সরকারি চাকরিজীবী। নিজ জেলায় তার কর্মস্থল। কর্মস্থলে সে ব্যাচেলরস কোয়ার্টারে থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবার এবং ছুটির দিনে বাড়ি আসে। মামুন সম্পর্কে আমি এতোটুকুই জানতাম। কিন্তু বছর দুই আগে এক শুক্রবার বিকেলে সে আমার বাড়ি আসে। খুব হাসি-খুশি মেজাজে বলে মামা, আমি বিয়ে করবো। আমিও খুব খুশি হয়ে বললাম শুভস্য শীঘ্রম।

অবশ্যই, আমি আপনার দোয়া নিতে এসেছি। বললাম, বলো, আমি কি করতে পারি?

মামুন খুব অকপট ছেলে। সে তার ইউনিভার্সিটি জীবনের কথা বললো। বললো, তিন বছরের জুনিয়র পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মেয়ের সঙ্গে তার প্রেমের গল্প।

মেয়েটি এবার মাস্টার্স দিয়েছে । রেজাল্টের অপেক্ষা করছে। মামুন মেয়েটির বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, কিন্তু তিনি তা নাকচ করে দিয়েছেন।

বললাম, তা হলে?

মামুন বললো, সে জন্য আপনার সাহায্য নিতে এসেছি। মেয়েটির নাম শাম্মী। আমি শাম্মীকে নিয়ে সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখেছি। শাম্মী খুব ভালো মেয়ে এবং তার পরিবারের লোকরাও ভালো। আমরা কখনো কাউকে বিদায় বলবো না এবং ভেতরে বাইরে যেন সুন্দর থাকতে পারি- এই প্রার্থনা করেছি।

ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্রজীবনে প্রেম নিয়ে আমার কিছু খারাপ অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত দুঃখবোধ রয়েছে। রাজনীতিবিদরা নিজের সন্তানদের বিদেশে পাঠিয়ে অন্যের সন্তানকে রাজনীতির ফাদে আটকিয়ে প্রাণ হরণ করেন। যাদের ছেলেমেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তারা ছাত্র রাজনীতির যন্ত্রণায় সর্বক্ষণ শঙ্কিত থাকে এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা। আর যেসব মেয়েরা প্রেমে পড়ে তাদের মা-বাবা মনে এতো কষ্ট পান যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এসব কথা থাক।

আমি বললাম, দেখো মামুন, মেয়ের বাবা সঠিক কাজটি করেছেন। এখন তোমার কি ইচ্ছা তাই বলো। শাম্মীর বাবার নাম...।

আপনার সুপরিচিত। মামা, আমার জন্য তার কছে কি একবার যাবেন? মামুন সরাসরি আমার দু'হাত চেপে ধরলো।

জীবনে অনেক স্তর অতিক্রম করে এসেছি। কখনো প্রেমে পড়িনি, কিন্তু জীবনের শুরুতে একটি ছোট মেয়েকে বিয়ে করেছিলাম। কিছু অনাকাঙ্খিত কারণে মাত্র আট মাসের মাথায় তার সঙ্গে আমার ডিভোর্স হয়ে যায়। মনে করেছিলাম আট মাসের একটি যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এখন বৃদ্ধ হয়েছি, তবু মনে হয় সে হৃদয়ের খুব কাছেই আছে। আজ ভাবতে কষ্ট হয়। চিন্তা করলে অসহায় বোধ করি। জীবনের অন্তত এই দিকটি নিয়ে আমি আর কখনোই কাউকে সরি বলবো না।

মামুনকে বললাম, আমি চেষ্টা করবো। তবে তার আগে বলো ঘটনাটি মেয়ে পরিবারের কে কে জানে।

শুধু মেয়ের মা জানেন।

আমি এমনটি সন্দেহ করেছিলাম। আমার ব্যক্তিগত ধারণা আয়া-বুয়া থেকে মহারাণী পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি নারীর জীবনে এমন অবর্ণনীয় ঘটনা ঘটে যা সে কখনো স্বামীকে বা বান্ধবীকে, পিতাকে বা সন্তানকেও বলতে পারে না। কিন্তু মাকে ঠিক ঠিক বলতে পারে। যেসব মায়েরা কঠোর তাদের মেয়েরা এসব বাজে ঝামেলা থেকে দূরে থাকে। আমি মামুনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটির কি ছোট খালা আছে?

হ্যা, আছে।

মামুনকে উপদেশ দিলাম, মেয়ের ছোট খালাকে দিয়ে ঘটনাটি তার বাবাকে জানাও। আমি একমাস পর তার সঙ্গে সাক্ষাত্ করবো।

মেয়ের বাবা একজন ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রাণ ও স্থির বুদ্ধির মানুষ। তিনি গ্রাম ছেড়ে বাজারে নিজস্ব দোতলা বাসায় থাকেন। একদিন তার সঙ্গে সাক্ষাত্ করলাম। এরপর তার সঙ্গে আমার বেশ কবার সাক্ষাত্ ও আলোচনা হয়। শেষে উভয় পরিবারের মধ্যে সামাজিকভাবে বর-কনে দেখাদেখির পর বিয়ের দিন ধার্য করা হয়।

বিয়ের নির্দিষ্ট তারিখটি এসে গেল। তবু আমি কোনো পক্ষ থেকেই আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পেলাম না। ভাবলাম, কোনো সমস্যা হবে না। আর দুঃখবোধ? তা করেই বা কি লাভ। আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত দুঃখ পাওয়ার মতো কতো ঘটনাই তো ঘটছে। এই আমি, এই আপনি, এই আমরা সবাই সুখ-দুঃখের ভেলায় ভেসে চলেছি। মনে করুন আপনার ঘরে খুব সুন্দর একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিল। আপনি খুব খুশি হলেন, প্রতিবেশী ও বন্ধুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করলেন, পচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে তাকে লালন-পালন করলেন, সুখে-দুঃখে, অভাব-অনটনে অথবা মূল্যবান সম্পদ বিনষ্ট করে তাকে উচ্চশিক্ষা দিলেন। সে একটি চাকরি পেল, প্রথম বেতন পেল, আনন্দিত হলো। কিন্তু সেই আনন্দে সে আপনাকে শেয়ার করলো না। একবারও বললো না আজ আমি প্রথম বেতন পেয়েছি। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, তুমি দোয়া করো বাবা! আপনি ব্যথিত হবেন? হতাশ হবেন? প্রয়োজন নেই। মনে রাখবেন এই স্বার্থপর পৃথিবীতে বেশি নিঃস্বার্থ হওয়া ভালো নয়।

একটি শুভ খবরের অপেক্ষায় আমি ছিলাম। পরদিন মামুনের এক বন্ধু আমার সঙ্গে দেখা করলো। সে বললো বিয়ে হয়নি।

আমি চমকে উঠলাম, বলো কি?

ছেলেটি বললো, হ্যা চাচা। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে উভয় পক্ষের গ্রামের আত্মীয়দের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষই বলতে থাকে এখানে বিয়ে দেবো না। এক সময় তা চূড়ান্ত রূপ নিল। মামুনের পক্ষের লোকজন তাকে টেনেহেচড়ে প্যান্ডেলের বাইরে নিয়ে আসে। এক সময় মামুন থমকে দাড়ায়। মামুন দেখলো, আমি দেখলাম, বিয়ে বাড়ির সবাই দেখলো শাম্মী দোতলার বারান্দায় দাড়িয়ে নতুন লাল শাড়ির আচলে চোখ-মুখ ঢেকে কাদছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। মামুনকে ঠেলে মাইক্রোতে তুলে দেয়া হলো। বিস্তারিত শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। এমন ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটে!

আর একবার কি চেষ্টা করবেন চাচা?

ছেলেটি আমাকে বিনীত অনুরোধ করলো। আমি বিব্রতবোধ করলাম। বললাম, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

এর কয়েক দিন পর মামুন তার মাকে কর্মস্থলে নিয়ে যায়। মাস দুয়েক পর দুজন বোরখা পরা মেয়ে আমার বাড়িতে এসে হাজির হয়। প্রথমে চিনতে পারিনি। তারা হলো শাম্মী ও তার এক বান্ধবী। বাইরে তাদের জন্য ভ্যানগাড়ি দাড়িয়ে ছিল, তাদের সঙ্গে আমার সামান্য কথা হলো। এক সময় বললাম, মামুন একজন সুপুরুষ কিন্তু ভাগ্যহীন।

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সঙ্গে থাকা মেয়েটি বললো সুপুরুষ না কাপুরুষ....

শাম্মী তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে তার বিয়ের কার্ড বের করে আমার হাতে দিয়ে বললো আগামী শুক্রবার আমার বিয়ে, আপনার দোয়া চাই।

তার দুচোখ ছলছল করছিল। বোরখার নেকাব কোনো মতে চোখ-মুখের ওপর ফেলে দিয়ে সে চলে গেল। আর আমি হিমালয়সম অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে ঘরের মধ্যে দাড়িয়ে রইলাম।

তারপর একটা সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। মনে করেছিলাম গল্পটা এখানেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তা হলো না। এ বছরের এক বর্ষায় মামুন ভিজতে ভিজতে আমার বাড়িতে এলো। তার চোখে-মুখে ক্লান্তি, অসহায়ত্ব ও শঙ্কার ছাপ। তাকে টাওয়েল, লুঙি ও জামা দিলাম। সে চাদর মুড়ি দিয়ে আমার খাটের ওপর বসলো। বললাম, কেমন আছো মামুন।

সে বললো, ভালো নেই মামা। মার হাপানি রোগটা শেষ পর্যায়ে এসেছে। ওষুধে কাজ হয় না, প্রায় সারাক্ষণ ইনহেলার টানতে হয়।
আমি তার মায়ের জন্য দুঃখবোধ করলাম।

মামুন বললো, আমি মায়ের শেষ ইচ্ছাটা পূরণ করতে চাই। আমি বিয়ে করবো।

আমি অসহায়ের মতো তার দিকে তাকালাম। বললাম, আমার হৃদয় খুব সংকীর্ণ, দায়িত্ববোধ সীমিত ও বিবেক ক্লান্ত। তাছাড়া আমি একজন বিড়ম্বিত এবং অপয়া। আমাকে তোমার বিয়ের কথা বলবে না।

মামুন খুব উত্তেজিত হয়ে দুই হাতের দশটি আঙুল দিয়ে নিজের মাথার চুল শক্ত করে চেপে ধরে বলল, উহ্ প্লিজ, ফরগেট ইট মামা- ফরগেট ইট। আমি বিয়ে করবো একজন বোবা মেয়েকে।

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হোয়াট? রিপিট এগেইন।

মামুন এবার শান্ত স্বরে বললো, একজন বোবা মেয়েকে বিয়ে করবো।

ভালোবেসে কেউ ভালো আছে- এমনটি জানা নেই। একজনকে দেহের ভেতর, অন্যজনকে দেহের ওপর রেখেই সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর দাম্পত্য ইতিহাস। সর্বত্রই মানুষের অন্তরে হাহাকার আর বাইরে ছদ্মবেশের প্রলেপ। প্রেম-বিশ্বাস সততার অন্তরালে রয়েছে অবিশ্বাস আর অসততার নিষ্ঠুর যৌনাচার। তাই বলে একজন প্রতিবন্ধীর সঙ্গে একজন সুস্থ মানুষের আজীবন প্রতারণার বন্ধন? আমি রাগত স্বরে প্রত্যাখ্যান করলাম না, এ হতে পারে না।

মামুন উদাসভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। কদম ফুল ফুটেছে। একটি ছোট্ট মেয়ে বড় হয়, স্ত্রী হয়, বধূ হয়, মা হয়। সংসারে তার কতো কাজ। একজন বোবা মেয়ে কি তা পারবে?

মামুন বললো, আমার ভেতরে বন্দি শব্দগুলো যেন কেউ শুনতে না পায় সে জন্য আমার একজন বোবা স্ত্রী প্রয়োজন। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি তার সঙ্গে প্রতারণা করবো না। মামুন এবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

৪৫ বছর আগে কলেজ জীবনে অন্ধ বধূ কবিতাটি পড়েছি। জানি না কবিতাটি এখনো স্ব-স্থানে আছে কি না। কয়েকটি লাইন আমার এখনো মনে আছে, হয়তো আজীবন মনে থাকবে। কিন্তু একজন বোবা মেয়ে সে শুনতে পারবে না, বলতে পারবে না, জানতে পারবে না; পৃথিবীর জুড়ে যার কাছে বোবা তাকে নিয়ে কি মামুনের কষ্ট হবে না? যা হোক, একদিন এক পেশাদার ঘটকের সঙ্গে দেখা করলাম। তাকে বিস্তারিত বলে মামুনের ঠিকানা দিলাম।

প্রায় মাস দেড়েক পর একজন সুশ্রী বোবা মেয়ের খোজ পাওয়া গেল এবং তাকে দেখা হলো। মামুনের এবং আমাদের পছন্দ হলো। মেয়ের মায়ের কাছ থেকে জানা গেল সে রান্না ও সাংসারিক কাজকর্মে দক্ষ এবং দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে অবগত। এছাড়া নানি মেয়েটিকে প্রয়োজন মতো শ্বশুরবাড়িতে সঙ্গ দেবেন। মামুনের মা অসুস্থ, তার খুব তাড়া ছিল। কিন্তু মেয়ের বাবা বললেন মেয়ের বড় ভাই বিদেশে, বোবা বোনটির বিয়ে দেখতে সে আগ্রহী। অল্প দিনের মধ্যেই সে বাড়ি আসবে। তিনি কদিন সময় প্রার্থনা করলেন।

খুব সুন্দর একটি মৃত্যুর জন্য আমাদের চেষ্টা ও অপেক্ষা করা উচিত। মামুনও হয়তো তার মাকে নিয়ে সেই চেষ্টা করেছিল কিন্তু মানুষের সব চেষ্টা সার্থক হয় না। মৃত্যু আসে। নিয়ম করে আসে, অনিয়ম করে আসে এবং অনিবার্যভাবেই আসে। মামুনের হতভাগ্য মা তার বোবা পুত্র বধূকে দেখে যেতে পারলেন না- তার মৃত্যু হলো।

কনে পক্ষের লোকজন মনে করেছিলেন বর তার মত পাল্টাবে। কিন্তু না, মামুন বাস্তবেই একজন সুপুরুষ। মেয়ের ভাই আসতে আসতে ঈদুল ফিতর এসে গেল। এসে গেল হরতাল, অবরোধ, ২৮ অক্টোবর। এখানে রাজনীতির কথা লিখতে চাই না- শুধু অনুভূতির এতোটুকু বলবো আমাদের ব্যক্তি জীবনে নৈতিকতার অবক্ষয় ও মূল্যবোধের অনুপস্থিতির কারণে দেশ ও সমাজের এক ক্রান্তিকাল চলছে। বিএনপি-আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে, ক্ষমতায় যেতে সাধারণ মানুষের জন্য কি কি অমানবিক ভুল করে চলেছে- তা নেতাদের ভেবে দেখা উচিত। যাহোক, এসব রাষ্ট্রীয় বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিয়ের দিন ধার্য করা হলো।

খুব ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হলো।

বিদায়ের সময় মা তার বোবা মেয়েকে মামুনের হাতে তুলে দিলেন। মা-বাবা দুজনই কাদছিলেন, কাদছিলেন সেখানে উপস্থিত অনেকেই। বোবা কনেটি শুধু রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকে বিদায় জানানোর এই আবেগময় দৃশ্যটি উপভোগ করছিল। তার চোখে ছিল না এক বিন্দু অশ্রু, ঠোটে ছিল না হাসির ঝিলিক। মামুন তার হাত ধরে মাইক্রোতে উঠলো। আমরাও উঠলাম। আমরা নববধূকে নিয়ে মামুনের বাড়ির পথে রওয়ানা হলাম। যেখানে তার মা নেই, থাকবে বোবা বধূ, আসবে নিঃশব্দ বাসর রাত, সীমাহীন ক্লান্তি ও সুখময় নিদ্রা! পৃথিবীর জন্য কতো মায়া, বেচে থাকার জন্য কতো সাধ, আশ্চর্য সুন্দর এই জীবন!

বড়গাছা, জয়পুরহাট থেকে
asabalibd@yahoo.com

পড়শি

সারাদিনের খাটুনিতে খুব ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছিল আদনান। নিজের ব্যবসায় যতো শ্রম দিতে পারবে ততো লাভ। আজ ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে ১১টা বেজেছে। তার দেড় বছরের মেয়ে পিয়াসা ঘুমিয়ে থাকলে কলিংবেল বাজালে জেগে যাবে, তাই দরজায় খুটখুট কড়া নাড়লো।

দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে, বোধহয় কাজের মেয়েটা ঘুমিয়ে গেছে। আবার কড়া নাড়তে যাচ্ছিল, এরই মধ্যে স্ত্রী জুই দরজা খুললো। পিয়াসা ঘুমিয়েছে কি না জানতে চাইলে জুই বললো, অনেক আগেই সে ঘুমিয়েছে।

এতো রাতে খেতে ইচ্ছা করছে না, খাওয়ার চেয়ে ঘুমটাই তার বেশি প্রয়োজন। তারপরও হাত-মুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসতে হলো, তা না হলে জুই বকবক করে রাতের ঘুম হারাম করবে।

ওর এ বিশ্রী স্বভাবের কারণে নিজেদের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও বাবা-মাকে ছেড়ে ভাড়া বাসায় উঠতে হয়েছে। কোনোরকমে সামান্য কিছু গলাধকরণ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল।

মনে আছে, পিয়াসার গায়ে-মাথায় একবার হাত বুলিয়ে চোখ বুজেছিল, হয়তো জুই বিছানায় আসার আগেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠোঁটে কিসের যেন স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। উঃ রাগে-অস্বস্তিতে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। আদনানের ঘুম ভেঙে গেছে বুঝতে পেরে জুইয়ের

জৈবিক উন্মাদনা আরো বেড়ে গেছে।

সে যতো বলছে আমার ভালো লাগছে না, ও যেন ততো মরিয়া হয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে জুইয়ের ডাকে সাড়া না দিলে, বহুবার পাওয়া নপুংসক খেতাবটি এখন আরো একবার নিশ্চিত তার কপালে জুটবে তাতে সন্দেহ নেই। সে জন্য উটকো ঝামেলা এড়াতে সে কষ্ট ও বিরক্তি চেপে জুইকে খুশি করতে বাধ্য হলো।

আদনানের সমস্যা হলো, রাতে একবার ঘুম ভাঙলে আর ঘুম আসতে চায় না। এদিকে জুইকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেখে ভীষণ রাগ হচ্ছে।

বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে ভাবলো, এখানে না থেকে ড্রয়িং রুমের সোফায় শুয়ে স্বাধীনভাবে রাত্রি যাপন করাই উত্তম।

ড্রয়িং রুমের সোফায় দীর্ঘক্ষণ চোখ বুজে শুয়েও ঘুম আসছে না। একে তো ঘুম আসছে না, তার ওপর কানের কাছে মশার ভনভন শব্দে আরো বিরক্তি লাগছে।

ঘুম না এলে যা হলো, এলোমেলো চিন্তা মাথায় ঘোরাঘুরি করছে। আজকাল ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়টিই তাকে বেশি জ্বালিয়ে মারে। বড় ব্যবসায়ী হলে যা হয় আর কি! মাথার ভেতর সব সময় ব্যাংক লোন, লাভ-লোকসান ও ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নামের ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে থাকে। এখন একটু ঘুমাতে পারলে আগামীকাল সকালে শরীরটা রীতিমতো ঝরঝরে হয়ে যেতো।

ঘুম আসছে না, এখন কারো সঙ্গে ফোনে গল্প করতে পারলেও মন্দ হতো না। কিন্তু রাত যে অনেক, কাকে ফোন করবে সে।

মনে পড়ছে, সেই কতো বছর আগের কথা। তাদের বাড়িতে মাসে দু-তিনবার মাঝরাতে একটা ভৌতিক টেলিফোন আসতো। বাবা, মা ও সে ফোনটা রিসিভ করে কখনো কারো কণ্ঠস্বর শুনতে পেতো না। এ টেলিফোনটার জন্য তারা ভীষণ বিরক্ত হতো। প্রথমদিকে হ্যালো হ্যালো করেও ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সে বিরক্তিতে রিসিভারটা রেখে দিতো। পরে এক সময় বুঝতে পেরেছিল, মাঝরাতের এ ফোনটা আসলে তার নিজের।

যে নামটা সে হৃদয়ে সযত্নে গেথে রেখেছে অথচ মুখে আনতে পারে না, এ ফোনটা তারই। সে জানে, এ ভাড়া বাসার ফোন নাম্বারটি ও জানে

না, তাই মাঝরাতের সেই টেলিফোনটি আর আসে না। তবে তার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়ে এখনো তার নিজের বাড়ির ঠিকানায় একটি করে বই আসে।

যতো কাজই থাকুক, আদনান তার জন্মদিনে বাবা-মায়ের সঙ্গে একটিবার হলেও দেখা করতে যায়। তখন মা তার হাতে একটি ভারি বড় খাম দিয়ে বলেন, প্রেরকের নাম-ঠিকানা নেই, দেখ তো খোকা, কে তোকে এটা পাঠিয়েছে।

খামটি হাতে নিয়ে অজান্তে তার বুক কাপিয়ে নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তারপর ক্রমেই আনমনে ডুবে যায় ভাবনার সাগরে।

হঠাত্ টেলিফোনের কৃং কৃং শব্দে কেপে উঠলো আদনান। এতো রাতে কে আবার ফোন করলো? কোনো দুঃসংবাদ নয় তো? বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে ভেবে শঙ্কিত হলো। দুরুদুরু বুকে টেলিফোনটি রিসিভ করে শোনে, বন্ধু পলাশের কণ্ঠ, কি ব্যাপার, এতো রাতে তুই কি কারো ফোনের অপেক্ষায় বসেছিলি নাকি?

না রে, এমনিতে ঘুম আসছিল না, তাই বসে আছি। তা এতো রাতে কি ভেবে ফোন করেছিস? তুই কি এখন নাইট ডিউটিতে, নাকি তোরও আমার মতো দশা?

ডিউটিতেই আছি। আচ্ছা, তোর রাত্রির কথা মনে আছে?

কেন বলতো?

একটু আগে ও মারা গেছে। ওর ডেথ কেইসটা সুইসাইডাল।

পলাশ রাত্রি সম্পর্কে আরো যেন কি কি বললো। কিন্তু কোনোকিছু আদনানের কানে পৌছালো না।

রাত্রি সুইসাইড করলো কেন? কি হয়েছিল তার?

শুধু এ দুটো প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে সে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত হতে লাগলো।

স্ত্রী-কন্যা, বাবা-মা থাকা সত্বেও আজ নিজেকে খুব নিঃস্ব লাগছে। তুচ্ছ একটা ঘটনায় তাদের আর দেখা ও কথা না হলেও তারা মনে-প্রাণে পরস্পরের বন্ধু। নিছক আত্মাভিমানে এ সুহৃদ নীরবতায় কাটিয়েছে অনেক বছর। তারপরও রাত্রি ছিল তার বদ্ধ কুঠুরির একমাত্র জানালা, যেখান দিয়ে আদনান আকাশ দেখতো আর নিঃশ্বাস নিতো বুক ভরে।

সেই রাত্রি এখন আলো না আধারের যাত্রী সে জানে না, শুধু জানে তার হৃদয়ে যে রাত্রির বসবাস তার কখনো মৃত্যু নেই।

আমৃত্যু তার চেতনায়-নিঃসঙ্গতায় সে পড়শি হয়ে বেচে থাকবে।

সেনপাড়া পর্বতা, ঢাকা থেকে

প্রেমিকা

তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় শিশুকালে। ছেলেবেলায় সে-ই ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। সকালে উঠে হাতমুখ ধুয়েই দৌড়ে যেতাম তার কাছে। ঘুম ঘুম চোখে সে আমার দিকে তাকিয়ে একটা রহস্যময় হাসি দিতো। আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, সে এতো সুন্দর করে হাসে কিভাবে?

তার গায়ের রঙ ছিল গোলাপের পাপড়ির মতো। কিন্তু গোলাপের কাটার মতো কোনো কাটা ছিল না তার। তার শরীরটা ছিল মসৃণ। আমি বারবার তার শরীর স্পর্শ করতাম। সে লজ্জায় লাল হয়ে যেতো। কিন্তু বাধা দিতো না। আমার স্পর্শ, আমার আদর আরো গভীরভাবে উপভোগ করতো। এভাবে আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর হতে থাকে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর বদলায়। একদিন আমি কেন যেন তার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেললাম। সেদিন তার চেয়ে আরো বেশি রূপবতী, গুণবতী আমাদের বাসায় এলো। শুরু হলো আমার দ্বিতীয় প্রেমের কাহিনী।

সে-ও ছিল আমার সমবয়সী। তার সঙ্গে সময় কাটাতে আরো বেশি ভালো লাগতো। তার শরীর ও মন দুটোই ছিল আকর্ষণীয়। মনে আছে, একদিন নিজ হাতে তাকে জামা পরিয়ে দিয়েছিলাম। তার সৌন্দর্য আমাকে পাগল করে তুলতো। সারাটা দিন তার কথাগুলো কানে বাজতো। সারাটা রাত তাকে স্বপ্নে দেখতাম। সে আমার পাশেই ঘুমাতো। কিন্তু কখনো তার সঙ্গে খারাপ কিছু করার চেষ্টা করিনি। কারণ আমি বিশ্বাস করতাম, প্রকৃত ভালোবাসা শুধু মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দেহ তো কেবল মনের আধার।

একদিন আমরা একসঙ্গে প্রথম স্কুলের আঙিনায় পা রাখলাম। আমি তাকে ধরে ছুটে বেড়ালাম ছোট্ট মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। তার সঙ্গে বসে ক্লাসগুলো খুব উপভোগ করতাম। সে আমাকে সর্বদা সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতো। আমার দুঃখ সে মোটেই সহ্য করতে পারতো না। সে তার সাধ্য অনুযায়ী আমার দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করতো। আমিও সুযোগ পেলেই তাকে বুকের মধ্যে আগলে রাখতাম। এভাবে আমাদের স্কুল জীবনের প্রথম বছরটা পার হলো। দ্বিতীয় বছরের শুরুতেই সে আমাদের বাসা ছেড়ে চলে গেল। আমি আবার একা হয়ে পড়লাম। তবে এবার পরিচয় হলো আরো তিনজনের সঙ্গে। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও আমাকে একইভাবে ভালোবাসলো এবং আমার মনও তিনজনকেই সমানভাবে পছন্দ করলো। তারা জানতো, আমি তাদের তিনজনকেই ভালোবাসি। কিন্তু এতে তারা কখনো মনে আঘাত পায়নি। বরং একজনের সঙ্গে যখন সময় কাটাতাম, বাকি দুজন সামনে থাকলেও কোনো অভিযোগ করতো না। তারা নিজেদের সঙ্গে হবু সতিনের মতো আচরণ করতো। কখনোই তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতো না। এভাবে পার হলো আরো এক বছর।

পরের বছর তারাও কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এবার বন্ধুত্ব হলো আরো ছয়জনের সঙ্গে। এক বছর পর তারাও চলে গেল অনেক দূর। এভাবে বছর বছর প্রেমিকা বদল করতে করতে পেরিয়ে গেলো আঠারোটি বসন্ত। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, আমার বর্তমান প্রেমিকার সংখ্যা একশর কাছাকাছি এবং এ সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারাও আমাকে সমানভাবে ভালোবাসে, যেমনটা আমি ভালোবাসি তাদের। তারা সবাই আমার বিশ্বস্ত, কখনো আমার ক্ষতি করেনি, করবে না- এটা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।
এতোগুলো প্রেমিকার সঙ্গে সময় কাটাতে কাটাতেই রাত এসে যায়। তারপর চলে নৈশ আলাপ। চলে ১২টা পর্যন্ত। তারপর আমি ঘুমাই। পাশেই বুক শেলফের ওপর তারাও ঘুমায়।
ভাবছেন, কিভাবে সম্ভব? হ্যা, তাও সম্ভব। কারণ আমার প্রেমিকারা আর কেউ নয়, আমার পাঠ্যবইসহ অন্যান্য বিচিত্র কিছু বই। আমি তাদের সেই ছোটবেলা থেকে ভালোবেসেছি, ভালোবাসছি এবং আজীবন ভালোবাসবো। আমাদের ভালোবাসা কখনো মলিন হবে না। আমৃত্যু আমি তাদের, তারা আমার, আমরা আমাদের। এ ভালোবাসা দিবসে আমার প্রাণপ্রিয় প্রেমিকাদের জানাই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে অফুরন্ত ভালোবাসা।
শালগাড়িয়া, পাবনা থেকে

ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মীরা

খুব সকালে মেয়েকে নিয়ে প্রাইভেট টিউটরের কাছে যাই, সব মা এক পাশে বসে থাকি, আমাদের বোর লাগে ভেবে প্রতিদিন সকালের সংবাদপত্রটি আমাদের হাতে তুলে দেয়া হয়।
সেদিন আমি প্রথমে গিয়েছি এবং কাগজটি আমার হাতেই আগে আসে। ইতিহাসকে আমি অনেকভাবে দেখেছি। যদিও ১৯৭১-এর যুদ্ধ দেখিনি, তবুও নৃশংসতার ছবি দেখে বিস্মিত হয়েছি। আবার যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতার চুক্তির স্বাক্ষর দেখে বিমোহিত হয়েছি। শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে কখনো সুখ অনুভব করেছি আবার দুঃখও পেয়েছি।
কিন্তু আজ আমি এ কি দেখছি! আমার দেশের নাগরিকের হাতে শান্তির পুরস্কার। কতোটা অহঙ্কার যে আমি বোধ করছি, লিখে বোঝানোর মতো নয়। মনে হয় স্বয়ং আজরাইল এলেও গর্ব করে বলবো, আমাকে আস্তে মেরো, আমি কিন্তু শান্তিতে নোবেল পাওয়া দেশের নাগরিক। আবার স্তব্ধ হয়ে ভাবলাম, যে দেশের নাগরিক শান্তির জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার পেল, অথচ সে দেশের নাগরিক হয়ে আমরাই সবচেয়ে অশান্তিতে আছি। আমি তো ভেবেছিলাম সংবাদটি দেশের রাজনীতিবিদদের মাঝে বিরাট সাড়া জাগাবে, সবাই বিভেদ ভুলে এক হয়ে এ শান্তিকে সামনে রেখে দেশের শান্তির জন্য কাজ করবে। যে দেশ এমন এক সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে দেশেই অশান্তির বার্তা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ লজ্জা আমরা কোথায় লুকাবো?
আমরা কেন যে বুঝি না, আমাদের মতো হতদরিদ্র দেশে হরতাল, অবরোধ হলো হীরার গয়নার মতো বিলাসিতা। আমার হাসি পায়, যখন শুনি আমাদের জন্যই এরা রাজপথে। প্রায়ই একটি কথা আমার মনে হয়, সত্যিকারের স্বাধীনতা আমাদের এখনো আসেনি, তা না হলে নিজ দেশে পরবাসী হয়ে আমাদের থাকতে হতো না। রাজনীতির বিষয়ে মানুষের ধারণা এমন হয়ে আসছে যে, খুব দূরে নয়, ভবিষ্যতে কোনো ভদ্র ঘরের সন্তান রাজনীতিতে আসবে না। অন্তত আমার সন্তানকে তো আমি দেবোই না। যে শান্তির বার্তা থেকে আমি উৎসাহ পেয়েছি আমার সন্তানকে আগামীতে এটাই বলবো, শুধু দেশের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য কিছু একটা করো, যা করতে রাজনীতি লাগে না।
আমি অল্প শিক্ষিত এক গৃহবধূ। বুঝতে পারছি না কিভাবে আমার অভিব্যক্তি প্রকাশ করবো। এ ভালোবাসা দিবসে আমার অভিনন্দন রইলো ড. ইউনূসের প্রতি। অভিনন্দন রইলো গ্রামীণ ব্যাংকের সব কর্মীর প্রতি। আর ভালোবাসা রইলো যাযাদির সব পাঠকের প্রতি।
নারায়ণগঞ্জ থেকে

চুল

প্রায় দেড় বছর দেশে অবস্থান করে দ্বিতীয়বারের মতো প্রবাসী হওয়ার কয়েক দিন আগে ভাবলাম পুরনো ঢাকার পুরনো ক্যাম্পাস থেকে একটু ঘুরে আসি। কিন্তু রাস্তায় এতো জ্যাম রিকশায় বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেছি। কিছুক্ষণ পর পর রিকশা একটু এগিয়ে যায় আবার দাড়িয়ে থাকে অনেক সময় ধরে। পাশেই একটি ঘোড়ার গাড়ি। পুরনো ঢাকার ঐতিহ্য ওই ঘোড়ার গাড়ি বর্তমানে রাস্তায় গুটিকয়েক দেখা যায়। ঘোড়াগুলোও পুরনো, জরাজীর্ণ বা রুগ্ন। চলমান ঘোড়ার গাড়ির দুইটি ঘোড়ার মধ্যে একটি ছিল হাড্ডিসার, আরেকটি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। পেছনে একগুচ্ছ লেজ, ভালোই দেখাচ্ছিল। রাস্তা কিছুটা ফাকা হলে গাড়িটি আইল্যান্ড থেকে একসারি সরে গিয়ে দুই তিনটা রিকশা ওভারটেক করে এগিয়ে গেল। ফলে আমি ওই ঘোড়ার গাড়ি থেকে আরো দুইতিনটা রিকশার পেছনে পড়ে গেলাম। এক পর্যায়ে যানজটের মধ্যে রিকশার ফাক দিয়ে ওই পরিচ্ছন্ন ঘোড়াটির লেজ আমার নজরে পড়লো। অজান্তেই বার বার দৃষ্টি সেদিকেই

যাচ্ছিল। যানযট হাল্কা হলে রিকশাচালক একটানে ৪/৫টা রিকশা পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। এবার কাছাকাছি এসেই তাকালাম ওই ঘোড়ার লেজের দিকে। কিন্তু হায়! কি দেখলাম? একদম বোকা বনে গেলাম। দেখে লজ্জিত ও বিব্রত হলাম। দেখার মাঝেও কি ভুল হয়? নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তিনি একজন আধুনিক ললনা। তার চুলগুলো ওই ঘোড়ার লেজের মতোই, পার্থক্য করা কঠিন। খুব আপসোস হলো। কেন মেয়েরা নিজেদের চুলগুলোকে রাঙিয়ে ঘোড়ার লেজের মতো করে ফেলে? কেমন দেখায়? রাঙানো ওই চুলগুলোকে কি রঙে প্রকাশ করা যায়? বাংলায় বললে বাদামি আর ইংরেজিতে ব্রাউন, কেউ বলবে মেহেদি কালার অথবা কেউ বলবে গোবরে কালার। যে যেভাবেই বলুক না কেন, আসলে কেমন দেখায়? মেহেদি লাগিয়ে চুলের প্রকৃত রংটাকে পরিবর্তন করে ফেলে। সে ক্ষেত্রে সাদা চুলটাকে ভালো মানায়, বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পাকা চুলে মেহেদি লাগিয়ে লাল করে রাখা।

মুসলমানদের জন্য মেহেদি লাগানো সুন্নত, তবে শরীরের বিশেষ কয়েকটি অংশে। মহানবী দাড়িতে ও চুলে মেহেদি ব্যবহার করেছিলেন। সেই হিসেবে আমরা ব্যবহার করতে পারি, তবে কালো চুলে বা কালো দাড়িতে ব্যবহার করলে তেমন একটা বোঝা যায় না। সাদা হলেই ভালো দেখায়। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান যুগের মেয়েরা মেহেদিকে সুন্নত অর্থে ব্যবহার করে না। তারা ব্যবহার করে ওয়েস্টার্ন স্টাইল হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য অর্থাত্ আধুনিক হওয়ার একটা অপচেষ্টা মাত্র। তাই তারা চুলে, হাতে, এমনকি পায়েও মেহেদি ব্যবহার করে থাকে। মূলত পায়ে মেহেদি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ হারাম। যা মহানবীর দাড়িতে স্থান পেয়েছিল তা কিভাবে মুসলিম উম্মার পায়ে স্থান পায় বোধগম্য নয়।

প্রকৃতির অবদান কালো চুলে যদি মেহেদির রঙটা ফুটে না ওঠে তাহলে বিউটি পার্লারে ব্যবহৃত হয় স্পিরিট জাতীয় এক ধরনের কেমিকাল যা চুলে লাগানো মাত্রই ধোয়া ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশ করে ফেলা হয় বলে জানা গেছে, অর্থাত্ চুলের প্রকৃত রঙটাকে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অতঃপর ব্যবহার করে কাঙ্ক্ষিত রঙ। সেই রঙ দিয়েই সাজে বিভিন্ন স্টাইলে। পরনের পোশাক যদি হয় লাল তাহলে মেচিং করে চুলের রঙটা করা হয় লালচে, যদি হয় নীল তাহলে নীলচে। আর ব্রাউন কালার সব পোশাকের সঙ্গেই চালিয়ে নেয়, কিছুই করার থাকে না, কারণ চুল পুড়িয়ে আগেই মরীচিকা বানিয়ে ফেলেছে। প্রকৃত রঙ কালো আর থাকে না।

পশ্চিমি দেশের মেয়েদের চুল বাদামি, প্রকৃতিগতভাবেই এর উৎপত্তি। তাদের পোশাক-আশাক কৃষ্টি-কালচার সেই রকম। বাদামি চুল, সর্ট কামিজ তথা খোলামেলা পোশাক তাদেরই মানায়। বাঙালি মেয়েরা যদি কৃত্রিমভাবে ওই বেস ধারণ করে তাহলে কতোটুকু মানানসই হয় তা বিবেক খরচা করলেই বোঝা যায়।

বড় বিচিত্র আমাদের দেশের নারীরা। তারা স্বাধীনতা চায়। পশ্চিমি দেশের পোশাকে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এ কেমন সুন্দরী! যে যতো খোলামেলা ও স্বল্প পোশাক পরিধান করে চুলগুলোকে জঙ্গল বানিয়ে উন্মুক্ত মঞ্চে নিজের দেহকে প্রদর্শন করবে সেই-ই নাকি সুন্দরী। সব অবিচার মেনে নিচ্ছি আমরা। অথচ এই নারীদের মর্যাদা অনেক। ইসলামও নারীদের অনেক মর্যাদা দিয়েছে। একজন নারীই হচ্ছেন মা, বোন, প্রেমিকা, স্ত্রী অথবা মেয়ে। মেয়েরা হচ্ছে পুরুষের বাম পাজরের অংশবিশেষ। তাদের স্থান পুরুষের হৃদয়ে, হৃদপিণ্ড জুড়ে। হৃদয়ের ওই সিংহাসনটা একজন নারীর জন্য নির্মিত। নারী হচ্ছে পুরুষের প্রেরণা। সঙ্গত কারণে একজন পুরুষের জীবনে যদি কোনো বিশেষ নারীর আবির্ভাব নাও ঘটে, তাহলে বলা যায় মাও তো একজন নারী। আর আদর্শ সন্তানের ক্ষেত্রে মায়ের প্রেরণাই প্রথম ও প্রধান। সুতরাং নারী ছাড়া পুরুষ অচল। তাই তো যুগে যুগে এই পৃথিবী জুড়ে কবি, সাহিত্যিকগণ যতো কিছুই লিখে গেছেন তার বেশির ভাগই ওই নারী বা মেয়েদের নিয়ে। অথচ কয়জন মেয়ে আছে যারা পুরুষদের নিয়ে কাব্য বা সাহিত্য চর্চা করেছেন?

ঘুরে ফিরে আমার ওই একই আফসোস। মেয়েদের চুল কেন ঘোড়ার লেজের মতো? কালোর মাঝে খারাপটা কোথায়? এক সময় এই চুলকেই কালো করার জন্য মেয়েরা সাধনা করতো। চুলের যত্নে বিভোর থাকতো। লম্বা ঘন কালো চুলের জন্য বান্ধবীদের মাঝে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো। লম্বাচুলো বান্ধবীকে দেখলে হিংসায় অন্য বান্ধবীর অন্তরটা গজগজ করে জ্বলে উঠতো। প্রকাশ্যে কিছু না বলতে পারলে গাল বাকা করতো, ফোড়ন কাটতো, অযথা দোষ খুজে বের করতো অথবা বিভিন্নভাবে টিজ করতো। ঘন কালো কেশের নিমিত্তে প্রচার মাধ্যমগুলোতে বেশি বেশি বিজ্ঞাপন প্রচার হতো। মডেল কন্যার প্রকৃত চুল ছোট হলে পরচুলা লাগিয়ে লম্বা ঘন কালো চুল বানিয়ে টিভিতে প্রচার করতো (এখনো করে)। বিভিন্ন ধরনের প্রসেস ও তেলের বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। সেসব বিজ্ঞাপনে মেয়েদের জন্য লোভনীয় বিষয় ছিল ঘন কালো কেশ। সেই কেশ নিয়েই শিল্পীরা গেয়েছেন বিভিন্ন গান-মেঘ কালো আধার কালো, আর যে কলঙ্ক কালো... তার চেয়ে কালো কন্যা তোমার মাথার চুল .../ ঃতামার কাজল কেশ ছড়ালে বলে .../কবি লিখেছেন-চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা... ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমানে মেয়েদের মাংকি কালার চুল নিয়ে কি লিখবেন বা কি গাইবেন, প্রথিতযশা ও প্রজ্ঞাবান শিল্পী-কবি-সাহিত্যিকগণই ভালো জানেন। তবে নতুন করে কালো কেশ নিয়ে যদি কাব্য করা হয় তাহলে বর্তমানের সঙ্গে তার তেমন মিল খুজে পাওয়া যাবে না। ফলে বিষয়টা হাস্যকর হয়ে যাবে। তবে বাঙালি মেয়েরা যতোই মডার্ন হতে চায় না কেন - তা সব সময়ই বেমানান দেখাবে। কারণ বাঙালি নারীদের চিরকালই ১২ হাত কাপড় আর ঘন কালো কেশই মানানসই।

আল-জুবাইল, সউদি আরব থেকে
ayubalibd@hotmail.com

চিঠি

সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘের ছোটাছুটি। সে সঙ্গে দমকা হাওয়ার ঝাপটায় ধুলোপাতা উড়ছিল। হাওয়াটা কেমন যেন ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা। আনিস তাই জানালাটা খুলে দিল। পর্দাটা ভালো করে টেনে দিতে গিয়ে দেখলো স্কুলের ব্যাগ মাথার ওপর ধরে ফুটপাথের কোণ ঘেষে আসছিল তমা। স্কুল থেকে ফিরছে। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে আসতে বা যেতে এর আগেও তমাকে দেখেছে আনিস। কিন্তু আজ একটু মনোযোগ দিয়েই দেখলো। তমার বয়স এখন কতো! ক্লাস নাইনে যখন পড়ে, চৌদ্দতে তো পা রেখেছে বটেই। মেয়েটা হঠাত্ লম্বা হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনেই হয় না, নাইনে পড়ে। মায়ের গড়নই পেয়েছে।

মিনার ভারি কণ্ঠে সম্বিত্ ফিরে পেলো আনিস। জানালার ধার থেকে সরে এসে বিছানায় বসে সিগারেট ধরালো। এমনিতেই মিনার মুখটা ভারি। নাক আর চোখ দুটো ছোট বলেই বোধহয় এই ভারি ভাবটা। প্রায় বিশ বছরের ঘরণি। আনিস ঠিকই বুঝলো - কিছু একটা হয়েছে! মুখে কিছু না বলে একটা ভাজ করা কাগজের টুকরো আনিসের দিকে এগিয়ে দিল। কাগজের ভাজ খুললো আনিস। চিঠি! আনিস মিনার দিকে তাকালো। কলিং বেল বেজে উঠলো। আনিস বললো, তমা এসেছে।

এতো তাড়াতাড়ি? মিনা গম্ভীর কণ্ঠে বললো।

আজ বৃহস্পতিবার, মনে নেই বুঝি! হাফ স্কুল। যাই, ওকে খেতে দিতে হবে। চিঠিটা ভালো করে পড়ো।

আনিস চিঠিটা পড়ছে। সম্বোধন-টম্বোধন কিছু নেই। কাচা হাতের লেখা হলেও বিষয়টা কাচা নয়। শুরুতেই মানবেন্দ্রর একটা বিখ্যাত গানের কথা দিয়ে শুরু - আমি এতো যে তোমায় ভালোবেসেছি/তবু মনে হয়, এ যেন গো কিছু নয়/কেন আরো ভালোবেসে যেতে পারে না হৃদয়।

তারপর - সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। তোমার গানের কথা, সুর, কণ্ঠ আমাকে এক মুহূর্ত স্থির হতে দেয়নি। এ কি গান শোনালে তুমি? এভাবে আমার দেহমনকে অবশ করে দিলে কেন? এখন থেকে যতোবার তোমার দিকে তাকাবো - দেখবো না তোমাকে। দেখবো সুরের রূপাবয়বকে।

চিঠি থেকে চোখ তুললো আনিস। মিনা এসে দাড়িয়েছে। চাপা গলায় বললো, পড়েছো?

হু।

কে লিখেছে জানো? তোমার আদরের মেয়ে তমা। মিনা কেমন দাত চাপা করে বললো।

কিন্তু তুমি কি করে পেলে?

ওর টেবিল সেলফ ঝাড়পোছ করছিলাম। তখনই একটা বাধানো খাতা থেকে ভাজ করা চিঠিটা মেঝেয় পড়লো।

হু। আনিস চিন্তিত স্বরে বললো, এখন ওকে কিছু বলো না। ব্যাপারটা কদ্দুর গড়িয়েছে তা আগে জানতে হবে।

আনিস একটা সিগারেট ধরালো। এটা অবিশ্বাস্য! একেবারে চিঠি চালাচালি করে দেবে - এই ভাষায়, এই বয়সে? তমা এতোটা বেড়ে যাবে ভাবা যায় না। কিন্তু আনিসের মন থেকে একটা খটকা কিছুতেই যাচ্ছে না। তমা এ ভাষা পেল কোথায়? বেশ কিছু কঠিন বানানও সঠিক লিখেছে। তবে কি ওকে কেউ সাহায্য করেছে? কিন্তু ওর বান্ধবী বলতে তো নিশি আর মিতু। ওই দুজনও তো প্রায় সমবয়সী। ওরা এই ভাষায় লিখবে? অসম্ভব। মিনা হয়তো রাগের মাথায় এতোসব ভাবেনি। আনিসের চিন্তায় ছেদ পড়লো তমা ঘরে প্রবেশ করায়। অন্যদিন সে একটু দাপাদাপি করে। স্কুল থেকে ফিরেই স্কুল আর পড়া নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতো। আজ তেমন কিছুই বললো না। আজ একটু আনমনা। আনিস আড়চোখে তাও লক্ষ্য করলো। আনিস গলা খাকারি দিল। তারপর বললো, তমা, চুপ কেন? কি হয়েছে? মা বকা

দিয়েছে?

না, বাবা, সেসব কিছু নয়। আজ বাংলাদেশ-পাকিস্তানের প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ, ডে-নাইট। আজকের খেলাটা নিশিদের বাসায় গিয়ে দেখি? আমার কয়েকজন বান্ধবী ওদের বাসায় খেলা দেখবে আর মজা করবে। বাসায় একা খেলা দেখতে ভালো লাগে না। যাবো, বাবা?

অ্যা? তাইতো! আমার মনেই ছিল না খেলার কথা। তোর মাকে বলেছিস?

মা যেতে দেবে না। তমা ঠোঁট ফোলালো।

আচ্ছা যাস। তোর মাকে ম্যানেজ করে নিবো। তখনই মিনার ডাক শোনা গেল। খেতে ডাকছে।

খাবার টেবিলেই আনিস তুললো কথাটা - তমা আজকে নিশিদের বাসায় অন্য বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা দেখতে চাইছে - যাক।

মিনা মাথা নেড়ে বললো - ঘরে টিভি থাকতে অন্যের বাসায় খেলা দেখা কেন?

আচ্ছা ঠিক আছে। আজকে যাক। আনিস খেতে খেতে বললো।

মিনা আনিসের দিকে চোখ বড় করে একবার তাকালো। তারপর টেবিল ছেড়ে উঠে চলে গেল। একটা কথাও বললো না আর।

আনিস শোবার ঘরে এসে চেয়ারটায় গা ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। এই চলাফেরা বসার মধ্যেও চিঠির কথা কিন্তু আনিসের মাথা থেকে যায়নি। আসল কথা, তমা বাড়িতে থাক আনিস তা চাইছিল না। সে কথাটা বুঝিয়ে বলবে বলেই মিনাকে ডাকলো - এদিকে একটু শুনে যেও।

মিনা একটু দেরি করেই এলো। মুখ এখনো ভারি সেটা এক নজর তাকিয়েই বুঝলো। খাটের বালিশের নিচে রাখা চিঠিটা বের করলো আনিস। আর একবার চোখ বুলোতে লাগলো। মিনা রাগত স্বরে বললো - ডাকছিলে কেন?

তমাকে ইচ্ছে করেই খেলা দেখার অনুমতি দিলাম, আনিস বললো।

ওর বইপত্র, টেবিল, সেলফ খুজে দেখতে হবে। ওর নিজের লেখা আর কোনো চিঠি পাওয়া যায় কি না অথবা ও যাকে চিঠি লিখেছে, সে এর মধ্যে কোনো চিঠি লিখেছে কি না তা দেখতে হবে। আনিস এক নিঃশ্বাসে বললো।

ছেলেটা কে তা কিছুটা আন্দাজ করেছি। মিনা একটু গলা নামিয়ে বললো।

কে?

ওই যে মোড়ের লালবাড়িটা ও বাড়ির ছেলে। দিপু না টিপু কি নাম যেন। ঘাড় অবদি চুল, ছাটা দাড়ি গোপ। শুনেছি ভালো গান গায়।

আনিস চেয়ারে একটু সোজা হয়ে বসলো -দেখ, চিঠিটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। আমার স্থির বিশ্বাস - চিঠিটা তমা লেখেনি। মানে লিখলেও আর কেউ লিখে দিয়েছে - ও শুধু টুকেছে।

মিনা ঠোঁট উল্টালো - তোমার যতো উদ্ভট ধারণা।

আনিস সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে গুজতে গুজতে বললো - চলো।

কোথায়? মিনা ঠিক বুঝলো না।

তমার ঘরে।

দুজনে তমার ঘরে এলো। আনিস দ্রুত হাতে সব বই-খাতা খুলে খুলে দেখলো - কোনো টুকরো কাগজ পায় কি না। টুকরো কাগজ কিছু পেল তবে সেসব বুকলিস্ট, রুটিন, শচীনের কিছু পেপার কাটিং। টেবিলের ড্রয়ার খুললো। এটা-ওটা, স্কুলের ব্যাজ, মাইনের বই এসব।

সবকিছুর নিচে দুটো ভাজ করা কাগজ, পুরনো হলদেটে। আনিস তার একটা ভাজ খুললো। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো ভীষণভাবে। বিদ্যুত্ চমকের মতো কতো দিনের পুরনো একটা জগত যেন ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। মিনার লেখা সেই কবেকার চিঠি। চমকে দুজনে দুজনার দিকে তাকালো।

- কি ঝানু মেয়ে দেখেছো? পুরনো ট্রাঙ্কটার একেবারে নিচে রুমালে বেধে রেখেছিলাম। ও কিভাবে যেন পেয়েছে চিঠিগুলো।

আনিস প্রথম চিঠিটায় চোখ বুলালো। ছোট্ট চিঠি। মিনার তখন অসুখ করেছিল। পরের চিঠিটার ভাজ খুললো। সেই গান দিয়ে শুরু। দুলাইন পড়তেই আনিস বুঝলো তমা হুবহু এই চিঠিটাই টুকেছে। আনিসের মনে পড়লো বিয়ের ছয় মাস আগে মিনাকে নিয়ে বোটানিকাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিল। মিনার অনুরোধে আনিস একটা গানও গেয়েছিল। ওর গানের গলা ছিল। তারপরেই এই চিঠিটা লিখেছিল মিনা।

আনিস চিঠিটা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে রইলো। মিনা ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে একটু চোখ বুলিয়ে আচলে বেধে রাখলো। তারপর আনিসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লজ্জা ঢাকার জন্য দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলাবাগান, ঢাকা থেকে

তাবিজ

বন্ধু মহলে আমি গোবেচারা ও নিরামিষ হিসেবে পরিচিত ছিলাম। আমার চেহারাও তেমন জুতসই ছিল না। কোনো ভালোবাসা তাই জোটেনি। এ কারণে অন্য সবাই যখন তাদের ভালোবাসার ব্যাপারে আলাপ করতো, তখন নিজেকে খুবই হীন মনে হতো।

আমি এ কথাও খুব ভালো করে বুঝতাম, কাউকে ভালোবাসার কথা বলা আমার জন্য দুঃসাধ্য এবং বললেও তা কেউ গ্রহণ করবে না।

তাই নিজের ভেতর এক বুক ভালোবাসা বয়ে বেড়াতাম।

ক্লাস সেভেনে পড়ি। এখন প্রেম না এলে আর কখন আসবে? বুড়ো হলে? আমার বন্ধু স্বপন, গাবতলী স্বপন, তপন, বিদ্যুত্, কিসমত কার না প্রেম হয়েছে। সিনিয়রদের মধ্যে শাহীনভাই, কিরণভাই, কাজলভাই, নাসিরভাই, রাজাভাই, তুহিনভাই, হিমনভাই তো প্রেমের মহাকাব্য রচনা করে ফেলেছে। হায়, এ জীবনে ভালো ছাত্রের পরিচিতি নিয়ে আমি আর কতোদিন চলবো?

চেষ্টা যে আমি একদমই চালাইনি তা ঠিক না। আমিও অন্যদের মতো মেয়েদের স্কুল শিফট শেষ হওয়ার আগেই মাথায় সরিষার তেল দিয়ে চুলে সিথি করে বেশ কয়েকদিন দাড়িয়েছি। কিন্তু যা হওয়ার তাই হয়েছে। অন্যদের প্রেমিকা দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এমনভাবে চললে এইটে আর বৃত্তি পরীক্ষা দেবো না। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

যে কোনো নতুন মেয়ে পাড়ায় এলেই যদি সে অন্যদের হয়ে যায় তবে আমার বিয়ে ছাড়া আর কি গতি। বিয়ে করতে গেলে তো আর বৃত্তি পাওয়া না পাওয়া কোনো বিষয় না। আমি মর্মাহত হলাম। তিব্বত স্নো মাখা ছেড়ে দিলাম।

একদিন স্কুল পালিয়ে কে-টু সিগারেট খেতে নিদেনপক্ষে এক মাইল পথ পাড়ি দিলাম। যাই করি না কেন মনে মনে কাউকে ভালোবাসার ইচ্ছা ছিল ষোল আনার উপরে যদি কিছু থাকে তা। এমনই একদিন পাড়ার একমাত্র পাচতলা বিল্ডিংয়ের তিনতলার উত্তর দিকের ফ্ল্যাটে ভাড়া নিল সেলিয়ারা। বাড়িতে উঠতে দেরি। কিন্তু আমাদের জানতে দেরি নেই যে, ওর বাবা টিঅ্যান্ডটির উচ্চ পদের কর্মকর্তা এবং মা আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের শিক্ষিকা।

আমাদের মধ্যে যাদের প্রেমে ঘাটতি ছিল তারা নড়েচড়ে উঠলাম। কি যে টেনশন। নাওয়া-খাওয়া মাথায় উঠল। তিনতলার বারান্দা এবং জানালার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রেমপ্রার্থীরা ঘাড় ব্যথা করে ফেললাম। সবার আগে ব্যথা কনকনিয়ে উঠলো হাসু ভাইয়ের। গনি কাকার একমাত্র ছেলে। বাবা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে চাকরির বদৌলতে নতুন মডেলের সব কাপড়ই তার পরনে থাকতো।

আমি প্রমাদ গুনলাম। বুঝতে পারলাম, এ যুদ্ধ আমার জন্য মোটেই সাধারণ মানের নয়। অন্য লাইনে এগোতে হবে।

আমার বাসায় একটি নেয়ামুল কোরআন ছিল। সেখানে অনেক তাবিজের মধ্যে একটি ছিল প্রেমিকার মন জয় করার তাবিজ। একটি নকশা আকা ছিল, যা কাগজে আকতে হবে এবং এর নিচে প্রেমিকার নাম, বাবা ও মায়ের নাম লিখে যে কোনো গাছে ঝুলিয়ে দিতে হবে। বাতাসে সেই কাগজ দোল খেলে প্রেমিকার মনেও দোল দেবে এবং সে প্রেমিকের কাছে কালবিলম্ব না করে চলে আসবে। আমি উদ্যোগী হলাম। বাবার নাম সংগ্রহ করা কোনো ব্যাপারই হলো না। সেলিয়ার নাম সেলিয়াই লিখলাম। নকশা আকা আমার মতো ভালো ছাত্রের জন্য এক মিনিটের কাজ।

কিন্তু যে কাজটি আমার পক্ষে অসম্ভব তা হলো সেলিয়ার আম্মার নাম জানা। কাকে জিজ্ঞেস করবো, কি মনে করবে - এই ভাবতে ভাবতে আমার দিন যায়। বেশি দিন সময় দিলে হাসু ভাই কি করে তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। তাই মায়ের নামের জায়গায় লিখলাম, সেলিয়ার আম্মা। আরো বেশি কনফার্ম হওয়ার জন্য লিখলাম, চাচার ওয়াইফ।

তাবিজটি পরীক্ষার খাতা রিভিশন দেয়ার চেয়েও জটিল রিভিশন দিয়ে এক স্কুল দিবস কামাই করে আমাদের টিনের বাসার চালে উঠলাম। আম গাছে তাবিজটি বাধতে গেলে তপনদের বাসার লোক দেখে ফেলতে পারে। তাই আমাদের বরই গাছে বাধলাম। সেলিয়ার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাই এমন সময় নির্ধারণ করলাম যা তার স্কুল ছুটির পরপরই।

কিন্তু বাতাস কই? আমার তাবিজ তো দোলে না। কি মুসিবতে পড়লাম রে বাবা? জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে আমার পায়ে টিনের তাপে ফোস্কা পড়ে যায় যায়। বুদ্ধি এলো মাথায়। ফু দিলাম তাবিজে। দুললো আমার তাবিজ। আমি তাকিয়ে আছি কখন এবং কোনো দিক দিয়ে সেলিয়া

আসবে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, সে এলে আমি নেমে স্বাগত জানাবো। না হলে সে টিনের চালে উঠতে কষ্ট পাবে। কতো চিন্তা আমার। কিন্তু কোথায় সে? আমি তো গরমে আর টিকতে পারছি না।

চিন্তা করলাম, হয়তো স্কুল ড্রেস চেঞ্জ করতে বেশি সময় নিচ্ছে অথবা নিচে গেটের চাবি খুলতে দেরি করছে। টিকতে না পেরে আম গাছে চড়ে বসলাম। কাকের বাসা থাকায় অত্যাচার সহ্য করলাম অনেক। কয়েকটি কাকের ঠোকরও খেলাম। আর তো পারি না। আবার জোরে ফু দিলাম তাবিজে। আশায় দু হাত দিয়ে আম গাছ জড়িয়ে ধরে বসলাম। কিন্তু হলো না। নিরাশ হলাম। নিচে নেমে এলাম।
বাসায় স্কুল কামাই করার মোক্ষম উপায় হিসেবে গরমের দোহাই দিলাম। মন বসছে না। কোথায় আমার ভুল হলো। সেটা কি সেলিয়ার আম্মার নামের কারণে নাকি টিনের চালে একজন সোমত্ত মেয়ে ওঠার মতো অবাস্তব পরিকল্পনায়। খেয়ে বের হলাম বাসা থেকে। রাস্তায় দেখলাম তিনতলার দিকে চেয়ে হাসু ভাই ইশারায় সেলিয়ার সঙ্গে ভাব আদান-প্রদান করছে। পরাজয় মেনে বিকালে স্কুল মাঠে ফুটবল খেলতে নিজেকে রেডি করার জন্য বাসায় চলে এলাম। নিজেকে প্রবোধ দিলাম, এর পরেরবার দরকার হলে স্কুলের কেরানিকে হাত করে হলেও মেয়েদের মায়ের নাম জোগাড় করবো। আমি নিশ্চিত ছিলাম, শুধু মায়ের নাম না জানার কারণেই আমার এ বিফলতা।
পরে আমি বুঝতে পারি, মায়ের নাম স্কুল ভর্তি ফরমেও নেই। তাই এ লাইনে ইস্তফা দিলাম।
যতোদিন সেলিয়া আমাদের পাড়ায় ছিল ততোদিন সে হাসু ভাইয়েরই ছিল।

আমরা আজ প্রত্যেকেই দেশে-বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। কাউকে না বলা এ কথা কিছুদিন আগে আমার গিন্নি বন্যাকে বলেছিলাম। ওর প্ররোচনায় এবং সম্পাদনায় আমার আজকের এই লেখা। ড্রাফট লেখাটি আমার পাচ বছরের মেয়ে সারাহ তার নার্সারির মেধা দিয়ে পড়লো। তাদের ভালোবাসা পেতে আমাকে কোনো তাবিজ করতে হয়নি এবং এ কথাটিও সত্য, লেখাটি প্রকাশের জন্য আমি সম্পাদককে কোনো তাবিজ করিনি।

মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট থেকে

নতুন বাসর

যাকে নিয়ে এ লেখাটা সে আর অন্য কেউ নয়। সে আমার সেকেন্ড কাজিনের স্ত্রী অর্থাত্ ভাবি। বিয়ের পর যেদিন তাদের বাড়িতে গেলাম, সেদিন ভাবি আমাকে দেখে যেভাবে তাকিয়েছিল তা আজো ভুলতে পারিনি।
তারপর থেকে ফুপুদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করলাম। আমাদের বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে ফুপুর বাড়ি। প্রথম প্রথম ভাবি আমাকে দেখলে লজ্জা পেতো। পরপর কয়েক দিন যাওয়ার পর নিয়মিত গল্প করতে করতে ভাবির সঙ্গে ফ্র হয়ে গেলাম।

এ একা বাড়িতে আমার ফুপু, ভাইয়া আর ভাবি ছাড়া আর কেউ নেই। ফুপু প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। ভাবির স্বামীর ছিল বিশাল ব্যবসা, সকালে বের হলে গভীর রাতে বাসায় ফেরে। দিন রাতের বেশির ভাগ সময় সে ব্যবসা আর বন্ধু মহলে ব্যয় করতো।
বউকে সময় দেয়ার ব্যাপারে তার ছিল খুবই অনীহা। এ নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায় ঝগড়া লেগেই থাকতো। প্রথম তিন মাসের মধ্যে নতুন ভাবির গায়ে বেশ কয়েকবার হাতও তুলেছে।
প্রায় দিন ভাবির সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করার ফাকে আমাদের মধ্যে কখন যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তা আমি বুঝতেই পারিনি। স্বামীর সময় দেয়ার ব্যাপারে অনীহা ও আমার ঘন্টার পর ঘন্টা সময় তার পেছনে ব্যয় করে তার সব সুখ দুঃখের অংশীদার হওয়ায় সে আমার প্রতি অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে।
স্বামী তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে কিভাবে তারা রাতে ঘুমায় তাও আমাকে বলতে লজ্জা পেতো না।
একদিন তাদের প্রথম রাতের কথা বলেছিল। বাসর রাত সব মেয়েদের একটি সুখের রাত। আমার কপালে এমন হবে এ রাতটি তা কখনো ভাবিনি। আমি যখন বাসর ঘরে তার অপেক্ষায় বসে আছি, অনেক রাতে আমার স্বামী মদ্যপ অবস্থায় আমার ঘরে ঢুকলো, তারপর যখন সে আমাকে কাছে পাওয়ার জন্য বুকে টেনে নিলো তখন মদ আর সিগারেটের গন্ধে আমার বমি হওয়ার বাকি ছিল না। তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার সারা জীবনের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে।

সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জৈবিক চাহিদা মেটালো যাকে বলা যায় ধর্ষণ। এভাবে সংসার জীবন শুরু হলো। আমার মা, বাবা, ভাইবোন কাউকে কিছুই বুঝতে দিলাম না। তারা শুনলে হয়তো কষ্ট পাবে।

আমার স্বামী ব্যবসা, মদ আর খারাপ মেয়েদের নিয়ে রাত দিন ব্যস্ত থাকে। মন চাইলে মাসে দু-একবার আমাকে ধর্ষণ করে। আর পুরো মাস আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রেম ভালোবাসা কি তা হয়তো বোঝেই না।
একদিন দুপুর বেলায় ভাবিদের বাড়িতে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই দেখি প্রচণ্ড গরমে ভাবি শাড়ির আচল ফেলে শুধু ব্লাউজ পরে বসে আছে। আমাকে দেখে হাসি দিয়ে বললো, কেমন আছো, নিশ্চয়ই ভালো?

ভাইয়া কোথায় বলতেই বললো, চট্টগ্রামে গেছে, সাতদিন পর আসবে।

ভাবি আমাকে দেখেও তার বুকে কাপড় দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না। আর বললো, এ গরমে অস্থির লাগছে। আমিও তার সঙ্গে হ্যা-সূচক জবাব দিলাম।

অনেকক্ষণ বসে গল্প করার পর টেবিলে আমার জন্য খাবার দেয়া হলো। পাতলা ব্লাউজ পরে ব্রা-হীন স্তনযুগল দেখিয়ে আমার চোখের সামনে ভাবি বসে আছে। কিন্তু আমি এ আকর্ষণীয় দৃশ্য না দেখে চোখ ঘোরাতে পারছি না। হঠাত্ চোখের দিকে তাকিয়ে দেখি সেক্সে তার

ঠোঁট দুটি লাল হয়ে গেছে। এর মধ্যে ভাবি বলে উঠলো, কি দেখছো, ভাত খাও।
কিছু না বলে আবার ভাত খাওয়া শুরু করলাম।
খাওয়া শেষে অনেক সাহস করে ভাবিকে বললাম, আপনাকে একটা চুমো দেবো।
সে বললো, কেউ দেখে ফেললে?
বুঝতে পারলাম, কেউ না দেখলে ভাবির আপত্তি নেই।
তারপর সে বললো, চুমো খাওয়ার যখন এতো শখ, একটা বিয়ে করে বউকে যতো খুশি চুমো খাও এবং অনেক কিছুই খেতে পারবে।
এই বলে হাসতে হাসতে ভাবি চিত হয়ে খাটে শুয়ে পড়লো। কখন যে দরজা বন্ধ করেছে আমি তা খেয়াল করিনি।
হাতের ইশারায় তার পাশে বসতে বললো। তার কপালটা মাসাজ করার জন্য। আমিও এ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। আবার ভয়ও পাচ্ছিলাম। কারণ আমার ১৮ বছরের জীবনে যা করতে যাচ্ছি এটাই প্রথম।
আমার এক হাত দিয়ে ভাবির কপালে টিপছি, অনেকক্ষণ পর হঠাত্ অন্য হাতের নিচে নরম কি যেন অনুভব করলাম, সেই সঙ্গে শিরশির ধরনের এক অনুভূতি। আমার এ হাতটা ভাবি কখন যে তার স্তনে রেখেছে তা বুঝতেই পারিনি। এ অবস্থায় আমি দাড়িয়ে গেলাম।
ভাবি কাদো কাদোভাবে বলে ওঠে, তোমার কি কোনো সাহস নেই? কোনো ক্ষমতা নেই? কেমন পুরুষ তুমি? এই বলে আমাকে বুকে টেনে নিয়ে গেল।
আমি ভাবির ব্রা-হীন বুকের দিকে তাকিয়ে আছি। সে বললো, এতো কি দেখছো? এবার একটু আদর করো না, বলেই আমাকে জাপটে ধরলো। আমার দুই ঠোঁট ছিনিয়ে নিয়ে গ্রাস করে ফেললো। ভাবি এতো বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছিল যে, কোনো কিছুই পরোয়া করছিল না।
আমিও বিদ্যুতের বেগে দুই হাত দিয়ে ভাবিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। ভাবির খোলা বুক আমার বুকের সঙ্গে পিষে গেল। আমি কাপছি, ভাবিও কাপছে।
আজ আমার নতুন বাসর ঘর - ভাবি ফিশফিশ করে বললো।
আমরা হারিয়ে গেলাম।
প্যারিস, ফ্রান্স থেকে

ফাকিবাজ

কিরণ সিনেমা হল সংলগ্ন এক চালা টিনের ঘর।
আজাহারের চায়ের স্টল।
স্টলে ঢুকতেই চোখে পড়লো চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের একজন লোক এক কোণে বেঞ্চে বসে ভুসভুস করে সিগারেট টানছে। মাথার চুল উষ্কখুষ্ক, গালভর্তি খোচা খোচা কাচাপাকা দাড়ি। পরনে ফুলপ্যান্ট ও গায়ে ময়লা ছেড়া হাফশার্ট। ফুলপ্যান্টটা সমিলের শ্রমিকদের মতো নোংরা ও রঙচটা। চেহারায় ভদ্রলোকের ছাপ। মনে হলো কোথায় যেন দেখেছি। মনে করতে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কোথাকার কোন পাগল কে জানে।
লোকটি গভীর অন্তর্ভেদী চোখ দিয়ে তাকালো আমার দিকে। ফিক করে হেসে ফেললো। তারপর আমার দিকে লক্ষ্য করে বললো, কিরে? কি দেখছিস? ভালো করে দেখতো আমাকে, চিনতে পারিস কি না?
তুমি আমাকে চেনো? তোমার বাড়ি কোথায়?
চিনি। তোকে আমি ঠিক চিনে ফেলেছি। কিন্তু তুই আমাকে এখন পর্যন্ত চিনতে পারলি না।
আচ্ছা, বলতো আমার নাম কি? আমি কি করি? এতোই সহজ! দে আগে একটা সিগারেট দে। বলেই একটা বিকট হাসি দিল।
ব্যাপারটা আমার কাছে খুব অদ্ভুত মনে হলো। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে এক গাল ধোয়া ছেড়ে বললো, তুই শালা একটা ফাকিবাজ। চাকরি পেলি, বিয়ে করলি কিছুই জানালি না? এতো তাড়াতাড়ি সব কিছু ভুলে গেলি? তোকে যখন দেখলাম তখন ভাবলাম, ভালোই হলো। রাতটা তোর বাড়িতে থাকবো। কিন্তু তুই যখন চিনতেই পারলি না তখন কি করে থাকা যায়?
আমার সঙ্গে বন্ধু আহসান। সে ইশারা করলো ওখান থেকে সরে আসার জন্য।
ফেলে আসা অতীতের স্মৃতির মধ্যে ডুব মারলাম। যদি উদ্ধার করতে পারি তার পরিচয়। হঠাত্ মনে পড়লো আমার, উৎপল নামের এক বন্ধু ছিল কলেজ জীবনে।
তুই কি তাহলে উৎপল?
এতোক্ষণে চিনতে পারলি? এতো দেরি লাগলো আমাকে চিনতে? কথাটা বলার সময় তার মুখে একটু হাসির ঝিলিক মেরেই আবার মরে গেল।
আমি ওর সামনে বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। স্টলে লোকজন তেমন নেই। উৎপল পাগল হলো কিভাবে ভাবতেই গা শিউরে উঠলো আমার।
কলেজে আমার খুব কাছের বন্ধু ছিল সে। কলেজের যে কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা, খেলাধুলা উৎপল ছাড়া কল্পনাই করা

যেতো না। উৎপল ভালো গান গাইতে পারতো। কবিতা আবৃত্তি করতে পারতো। ভালো বক্তৃতা দিতে পারতো। এক কথায় উৎপল ছিল কলেজের মধ্যমণি। উৎপলের এতো গুণ দেখে খুব হিংসা হতো আমার। শুধু ভালো ছাত্র হয়ে কি লাভ? কজন আমাকে পাত্তা দেয়? উৎপলের পেছনে লঙ্কা পায়রার মতো ঘুরঘুর করতো কলেজের সুন্দরী মেয়েরা। কোনো সুন্দরী মেয়ের একটু ভালোবাসা পাওয়ার আশায় উৎপলের পেছনে পেছনে আমিও ঘুরতাম।
প্রতিমার সঙ্গে উৎপলের সম্পর্ক ছিল। এদের ভালোবাসার কথা সবাই জানতো। অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল প্রতিমা।
এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে। উৎপল-প্রতিমা ওই কলেজেই থেকে গেল। ভর্তি হলো ডিগ্রি পাস কোর্সে।
উৎপলের সঙ্গে একদিন ট্রেনে রাজশাহী যাওয়ার পথে দেখা হয়েছিল। আমি তাকে আমার মাদার বখশ হলের ঠিকানা দিয়েছিলাম। প্রতিমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তখনো ওদের প্রেম ছিল জমজমাট।
এর কয়েক মাস পর উৎপল একটা চিঠি লিখেছিল আমাকে। দীর্ঘ এক চিঠি। এক সাগর কান্নায় ভরা চিঠি। উৎপল জানিয়েছিল প্রতিমা তাকে ফাকি দিয়েছে। কানাডায় ইমিগ্রান্ট এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।
চিঠি পড়ে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন। প্রতিমা শেষ পর্যন্ত উৎপলকে ফাকি দিতে পারলো ভাবতেই খারাপ লেগেছিল খুব। এতো গভীর সম্পর্ক কিভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়? সান্ত্বনা জানিয়ে উত্তর দেয়া সম্ভব হয়নি।

সিনেমার হাফ টাইমের রিং বাজলো। লোকজন বেরিয়ে পড়ছে সামান্য অবসরে। স্টলের সবগুলো জায়গা মুহূর্তে ভরে গেল। আমি তাকাচ্ছি উৎপলের দিকে।
উৎপল কিছু খাবি নাকি?
আমাকে শুধু একটা সিগারেট দে।
একটা সিগারেট দিলাম তাকে। উৎপল সিগারেটে জোরেশোরে টান দিতে দিতে বললো, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে। আজ রাতে তোর বাড়িতে থাকবো। সব বলবো তোকে।
বললাম, ঠিক আছে। তোকে অবশ্যই বাড়িতে নিয়ে যাবো।
আহসান আমাকে আবারো ইশারা করলো উৎপলের কাছ থেকে কেটে পড়ার জন্য। ভাবলাম ওকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া কি সমীচীন হবে।
বললাম, তুই এখানে একটু বস। আমি দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসছি। ফিরে এসেই তোকে নিয়ে যাবো।
উৎপল হাসতে হাসতে বললো, তুই আমাকে ফাকি দিচ্ছিস? বুঝি বুঝি- সব মতলব বুঝি।
না না, তোকে আমি ফাকি দিতে পারি? বললাম আমি।
স্টল থেকে বের হলাম। আহসান আমাকে যা তা বলতে লাগলো। এ রকম পাগলকে কেউ বাড়িতে নিয়ে যায়।
মনটা আমার খচখচ করতে লাগলো। ওকে বসে থাকতে বললাম। ও হয়তো আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আহসানকে বললাম, কাজটা মনে হয় উচিত হলো না।
সন্তর্পণে পালিয়ে এলাম কিরণ সিনেমা হলের ত্রিসীমানা থেকে।
রাতে ঘুম আসছিল না। উৎপল হয়তো এখনো বসে আছে আমার অপেক্ষায়। আমিও যে ফাকিবাজের দলে পড়ে গেলাম।
আমার ঘুমকাতুরে স্ত্রী অঘোরে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।
হঠাত্ ঘুমের ঘোরে আমাকে দুহাত দিয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো।
ভোলাহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ থেকে

উপহার

সেই যখন ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হলো আমার তখন সংসার সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না। কিসে ভালো-মন্দ বুঝতাম কম। স্বামী যা বলতো তাই করতাম। কোনো কথার অবাধ্য হতাম না। সহজেই আমি সবার প্রিয়পাত্র হয়ে গেলাম। নতুন সংসার ভালোই লাগছিল। সবসময় একটা আনন্দ কাজ করতো অন্তরে কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন ধরে রাখতে পারলাম না। দুবছরের মাথায় যখন কন্যা সন্তানের জননী হলাম বুঝতে পারলাম পরিবার খুশি নয়। তাদের আশা ছিল ছেলে হবে কিন্তু আমি তা দিতে পারিনি। মনে হচ্ছে সব দোষ আমারই। তারপরও প্রথম সন্তান, এজন্য তেমন বাড়াবাড়ি কিছু হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয়বারেও যখন কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম তখন বুঝতে পারলাম আমি যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছি। স্বামী অবশ্য আমাকে তেমন কিছু বলে না। তাই সবকিছু নীরবে সহ্য করি। দ্বিতীয় মেয়েটার চেহারায় মুগ্ধ হলাম কি সুন্দর বাচ্চা আমার। নিজের সন্তান এতো সুন্দর হতে পারে! তাই শাশুড়ির রাগ হলেও আমি তাকে পেয়ে খুশি হলাম। সংসার স্বাভাবিকভাবেই চলতে লাগলো। তবে মাঝে মধ্যে শুনতে পেতাম শ্বশুর-শাশুড়ি, পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে আফসোস করে যদি একটি নাতি দেখে যেতে পারতাম তাহলে মরেও সুখ পেতাম। অবশ্য আমারও খুব ছেলে সন্তানের মা হতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কেন জানি বিধাতা আমার ওপর নাখোশ, হয়তো আগের জন্মের পাপ।
শাশুড়ির অনুরোধে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গেলাম, কতো কিছু যে খেলাম তা বলতে পারবো না। এবার সবার বিশ্বাস নিশ্চয়ই ছেলে

হবে, সবার এতো আশা দেখে আমার ভয় বাড়তে লাগলো এবং যে ভয় পেয়েছিলাম তাই হলো সব আশাকে মিথ্যা করে দিয়ে আমি আবারো কন্যা সন্তান জন্ম দিলাম। এবার নিজের প্রতি নিজেরই ঘৃণা হতে লাগলো। শাশুড়ি আমাকে দু চোখে দেখতে পারে না। আমি নাকি অলক্ষ্মী নয়তো সাধু-সন্ন্যাসীর কথা তো বিফল হওয়ার নয়। কথার ভয়ে আমি সবসময় মাথা নিচু করে থাকি। বুঝতে পারলাম স্বামীও আমার ওপর অসন্তুষ্ট। আমার হাতের খাবার এখন আর তার ভালো লাগে না। সামান্য দোষে ভাত না খেয়ে উঠে যান।
যন্ত্রণায় নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিতে লাগলাম। কখনো ঠিকমতো খাওয়া নেই স্নান নেই চেহারাটা বিশ্রী হয়ে যেতে লাগলো। স্বামী আর আমাকে আগের মতো কাছে ডাকে না। এখন কেন জানি আমার বেচে থাকতে ইচ্ছা করে না। বাড়ি থেকে মা-বাবা এলে তাদের সামনেই শাশুড়ি এমন ব্যবহার করতো যা বলার নয়। ঠিক করলাম এ জীবন আর রাখবো না কিন্তু সেটাও পারলাম না। মরতে আমার ভীষণ ভয় করে। বুঝতে পারলাম এ কাজের জন্য প্রতিবেশীর আরো নিন্দার দরকার।
এক সময় মাথায় শয়তানি বুদ্ধি এলো। পরকীয়া কথাটা কেন জানি মাথায় চলে এলো। এক্ষেত্রে ধরা পড়লে আত্মহত্যা করাটা বেশ সহজ হবে। কিন্তু আশপাশে তেমন কাউকে তো দেখি না যারা আছে তাদের সামনে
শাড়ির আচল ফেলতে চাইলেও মন বলে দেয় না। এদিকে দিন দিন স্বামীর অবহেলাও বেড়ে চলেছে। অবশ্য এতে আমার লাভই বেশি হয়। যেদিন তিনি রাগ করেন সেদিন খারাপ
চিন্তাটা বেশি করতে পারি। চিন্তা আমার একটাই কাকে আমার মায়াজালে আটকানো যায়।
সব দিক খুজেও কোনো পথ পাই না। এখন মনে মনে ভাবি আমার যদি একটি দেবর থাকতো তাহলে কতো ভালো হতো। অথচ বিয়ের আগে এক ছেলে শুনে আমার বেশ ভালোই লেগেছিল। কখনো বা মাশুকের কথা মনে পড়ে যায়। স্কুলে পড়ার সময়ে সে একদিন হাতটা ধরেছিল তাতেই তাকে হিলের বাড়ি মেরেছিলাম। এখন যদি তাকে পেতাম তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিতাম। আমার চিন্তা থেকে একজন শুধু বাদ ছিল সে শুভ্র, কেন জানি হঠাত্ তাকে মনে পড়ে গেল। অথচ সে কতো কাছেই থাকে। হঠাত্ মনটা তাকে পেতে চাইলো, কিন্তু কিভাবে তাকে বলবো আমার মনের কথা।

সে কলেজের ভালো ছাত্র, আমি জানি যে কোনো ছেলেকে আগুনে পোড়ানো রূপ আমার আছে কিন্তু তাই বলে একটা ভালো ছেলের ক্ষতি করাটা কি ঠিক হবে? শয়তান মন বলে কি না অবশ্যই ঠিক হবে, তোর নিজের কথা একবার ভেবে দেখ। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করলাম কিন্তু পারলাম না, মনটা কেন জানি শুভ্রকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সুতরাং বিভিন্ন ছলে তাদের বাসায় যাতায়াত শুরু করলাম। তার মায়ের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করতাম কিন্তু মন থাকতো শুভ্রের দিকে। ও ভারি শয়তান। রুম থেকে মোটেই বেরোতে চায় না। শুধুই পড়ে আমি যে তার জন্য এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে আছি তা সে বুঝতে পারে না। তাই একদিন সাহস করেই তার রুমে ঢুকলাম। দেখলাম ঘুমাচ্ছে। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে কি নিষ্পাপ চেহারা। ইচ্ছা হলো তাকে জড়িয়ে ধরতে কিন্তু সাহস পেলাম না। চেয়ার টান দিতেই তার ঘুম ভাঙলো, উঠে বসলো এবং জানতে চাইলো কি জন্য এসেছি।
আমি সত্য কথাটা বলতে পারলাম না। কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে চলে এলাম। এভাবে বেশ কদিন তার রুমে গেলেও কিছুই বলতে পারি না। যাওয়ার আগে কতো প্রতিজ্ঞা করি কিন্তু তার ওখানে গেলে সব প্রতিজ্ঞা উড়াল দেয়। কিন্তু আমার যে তাকে জয় করতেই হবে। যেভাবেই হোক মুখ দিয়ে যখন পারলাম না তখন শরীর দিয়ে চেষ্টা শুরু করলাম।

সেদিন পুকুর ঘাটে তাকে স্নান করতে দেখে আমিও গেলাম। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তার সামনেই বুক থেকে শাড়ির আচলটা সরিয়ে নিলাম কিন্তু হাদারামের কাণ্ড দেখে খুবই রাগ হলো। আমার দিকে আর এক পলকও তাকালো না। দ্রুত স্নান করে চলে গেল। তারপরও নিজের সাহসের প্রশংসা নিজেই করলাম। আজ যখন আচল সরাতে পেরেছি একদিন পুরো শাড়িটাই সরাতে পারবো।
বিকালে তার রুমে গেলাম। দেখলাম পড়ছে। আমি তার পেছনে দাড়ালাম। তার মাথাটা আমার বুকটাকে স্পর্শ করতেই সে টেবিলের দিকে ঝুকে বসলো। সেদিন কোনো কথা না বলে চলে এলাম। আমার চলে আসার কারণ হয়তো শুভ্র কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। এখন আমি পথ চেয়ে থাকি কখন শুভ্র পুকুর ঘাটে আসবে। পুকুরে তাকে দেখলেই শত কাজের মাঝেও চলে আসি স্নান করতে।
নানাভাবে আমার শরীরটাকে তাকে দেখানোর চেষ্টা করি।
কিছুদিন পর লক্ষ্য করলাম তার লজ্জাটা একটু কমেছে। এখন আর আচলবিহীন বুক দেখতে তার লজ্জা করে না। আমারও কেন জানি তাকে আরো বেশি ভালো লাগতে লাগলো। একদিন সাহস করে তার পায়ের সঙ্গে আমার পা-টা স্পর্শ করালাম। শুভ্র নিশ্চুপ থাকলো, আমার সাহস বেড়ে গেল। আমি তার পায়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগলাম। এবং আলাদা একটা সুখ অনুভব করতে লাগলাম। এতোটুকুতে এতো আনন্দ! আমার তাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিল। তাকে একদিন বাসায় খাওয়ার অনুরোধ করলাম, সে এলো। খুশিতে আমি আত্মহারা, এই তো আমার সোনামণি কথা শুনতে শুরু করেছে। খুব যত্ন করে তাকে খাওয়ালাম। খাওয়া শেষে আচল দিয়ে মুখ মুছে দিলাম। বিনিময়ে সে আমাকে মিষ্টি একটি হাসি উপহার দিল। বুঝতে পারলাম আমার মায়াজালে সে আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে। কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে অনেকটা ফ্র হয়ে গেলাম। সব সময়ে সেক্স বিষয়ে প্রশ্ন করে তাকে গরম করতে চাইতাম।
সুযোগ বুঝে একদিন রাতে তাদের বাসায় মুভি দেখতে গেলাম। তার পাশে গিয়ে বসলাম। সবার অজান্তে তার হাতটা নিজের হাতে বন্দি করলাম এবং আঙুলগুলোকে খুব জোরে চাপতে লাগলাম। শুভ্র নিশ্চুপ থাকলো। শরীরটা গরম হতে লাগলো।
হঠাত্ বিধাতা বাড়তি একটা সুযোগ দিলেন অর্থাত্ ইলেকট্রসিটি চলে গেল। আমি মুহূর্তে তার হাতটা বুকে নিলাম। সে এবার তার পুরুষত্ব প্রমাণ করলো। শয়তানটা আমার ও দুটোকে এতো জোর করতে লাগলো যে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। আমি কানে কানে বললাম কাল দুপুরে বাসায় এসো।
পরদিন ফাকা বাড়ি (ছোট মেয়ে দুটো ছাড়া) কেউ নেই। আমি তার জন্য খুব করে সাজলাম। নতুন হলুদ শাড়িটা পরলাম। বেলা ২টার দিকে রাজপুত্র আমার কাছে এলো। আমি তাকে কাছে টেনে নিলাম। বললাম এতো দেরি হলো কেন? সে বললো মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তবেই এসেছে। যুদ্ধে নাকি আমার জয় হয়েছে। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম সবকিছু আমার উদ্যোগেই করতে হবে।

তাই লজ্জা-শরম ভুলে নিজেই তাকে বুকে টেনে নিলাম। দুজনেরই নিঃশ্বাস দ্রুত বইতে লাগলো।

তারপর কি হলো জানতে চান? না থাক ওটুকু না হয় অজানাই থাক। তাছাড়া ওই মুহূর্তের কথা কি লিখে বোঝানো যায়। ওটা তো অনুভবের ব্যাপার। সেদিন থেকে তার সঙ্গে বহুবার মিলিত হয়েছি। এখনো হচ্ছি। এখন আর আমার মরতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় তাকে নিয়ে পালাতে। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা কি পূরণ হয়? হয় না। কিছুদিন হলো বুঝতে পারছি আমি আবারো মা হতে যাচ্ছি। অবশ্য বাচ্চাটা তার নয়। সে আমাকে কনডম ছাড়া ইউজ করে না। তার ভীষণ ভয় যদি এইডস হয়, আমার অবশ্য সে ভয় নেই। ভাগ্যের ওপর নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি। যাহোক এখন এ পর্যন্তই থাক। পরিশেষে বলি, আপনারা আশীর্বাদ করবেন এবার যেন আমি আমার স্বামীকে একটি ছেলে সন্তান উপহার দিতে পারি। পাপী বলে ঘৃণা করবেন না যেন, আমরা আছি বলেই তো পুণ্যের এতো দাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

কালিয়া থেকে

চা

১৯৯৫ সালের কথা। আমি তখন সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের ছাত্র। বিয়ে খেয়ে বাসায় ফেরার পথে পাচচরের মোড়ে বাসের জন্য অপেক্ষারত। এ সময় হঠাত্ দাতে কিছুটা ব্যথা অনুভব করলাম। মাংসটা একটু শক্ত হওয়ায় দাতের এই করুণ অবস্থা। ভাবলাম এ মুহূর্তে যদি একটা দিয়াশলাইয়ের শলাকা হাতে পেতাম!

দেখলাম অল্প কিছুটা দূরেই একটা টি স্টল। কাছে গিয়ে কর্মরত পিচ্চি ছেলেটিকে বললাম, আচ্ছা দিয়াশলাইটা একটু দেখি তো? আমার কথা শুনে ছেলেটি একটু মুচকি হেসে দিয়াশলাইটি দুই আঙুলের মাধ্যমে বিশেষ কায়দায় বার কয়েক ঘুরিয়ে বললো, দিয়াশলাই দেখতে চান?

দেখেন ভাই দেখেন, ভালো করে দেখেন। আমাকে না দিয়েই তা যথাস্থানে রেখে দিল।

বুঝলাম ইয়ার্কি করা হচ্ছে। ইচ্ছা করছিল একটা চড় মেরে ওর সব কয়টি দাত ফেলে দিই। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ভেতরে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। কিছু সময় কাটার পর স্বাভাবিক কণ্ঠেই বললাম, একটা চা দেখি তো?

দেখলাম ছেলেটি ঝটপট একটা চা বানিয়ে আমার সামনে রেখে গেল। গরম চায়ের ধোয়া উড়ছে। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে চা কিন্তু আমার ভেতরের জমানো রাগ সহজে ঠাণ্ডা হচ্ছে না।

আপনার চা তো ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভাই। জলদি খেয়ে নিন। ছেলেটি উচু স্বরে ডেকে বললো।

প্রশ্ন করলাম, দুধ চিনি ঠিকমতো দিয়েছো তো?

সবই দিয়েছি। আরে ভাই আগে টেস্ট করেন। লাগলে মর্জিমতো নিতে পারবেন, কোনো অসুবিধা নেই।

আমি এবার চায়ের কাপটি একাত-ওকাত করে বললাম, সবই ঠিক আছে তবে লিকারটা একটু বেশি হয়ে গেছে বোধহয়। ঠিক আছে, আমার চা দেখা শেষ। আমি চললাম কেমন! খোদা হাফেজ।

চায়ের বিলটা? ছেলেটি একদম চেচিয়ে উঠলো।

চা তো খাইনি, বিল দেবো কেন? সহজ কণ্ঠে বললাম।

আমি যেতে উদ্যত। দেখলাম ছেলেটি এ সময় দৌড়ে গিয়ে তার মালিক নিয়ে হাফাতে হাফাতে এসে বললো, এই লোকটি চায়ের বিল দিচ্ছে না।

দোকানের মালিক শুকনো হাসি হেসে বললো, কি হয়েছে ভাই? বাচ্চা মানুষ। কোনো ভুল করেনি তো? আমাকে সব খুলে বলুন।

ইনি চায়ের বিল দিচ্ছেন না। ছেলেটি আবার তার মালিকের কাছে অভিযোগ করলো।

বললাম, চা তো খাইনি, বিল দেবো কেন?

চা খাইলেন না তো বানাতে বললেন কেন? ছেলেটি একটু রাগত স্বরে বললো।

বললাম, উহ। আমি তো তোমাকে চা বানাতে বলিনি। খেতেও চাইনি। শুধু একটা চা দেখতে চেয়েছিলাম। আমার চা দেখা শেষ, ব্যস। তোমার চা তো তোমারই আছে। বিল দেবো কোন কারণে?

ইতিমধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। পরিবেশ ভারি হয়ে উঠলো। আমি বিস্তারিত বিষয় দোকানের মালিককে খুলে বললে মালিক ছেলেটির গালে এক চড় মেরে আচ্ছামতো বকুনি দিতে থাকেন।

গুরুজনের সঙ্গে বেয়াদবি! মাপ চেয়ে নে। যা, মাপ চেয়ে নে। যা বলছি।

দেখলাম, ছেলেটির দুই চোখ জলে ছলছল করছে। আমার ভেতরে তখন বরফ গলতে শুরু করছে। ক্ষমা চাইতে কাছে আসতেই ওর কাধে হাত রেখে বললাম- ঠিক আছে, ঠিক আছে, ক্ষমা করে দিলাম। বড়দের সম্মান করো। দেখো সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, কেমন?

আমার কথা শুনে ছেলেটি হাউমাউ করে কেদে ফেললো। আমি চায়ের বিল দিলে মালিক তা নিতে আপত্তি জানালেন। চায়ের বিল নয়, আমি ভালোবাসাস্বরূপ ছেলেটির পকেটে তখন জোর করে ১০ টাকার একখানা নোট গুজে দিই। ছেলেটি ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে

থাকে। কেন জানি নিজেকে তখন অপরাধী মনে হচ্ছিল।
সাউথ কোরিয়া থেকে

বোকা

বার্ষিক পরীক্ষার পর বড় আপার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গেলাম। সেখানে যেতে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই খেয়েদেয়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি। মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে জড়িয়ে ধরছে। ঘুম ভেঙে গেল। এরপর বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বেয়াইন M আমার পাশে ঘুমিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে কেটে পড়লাম।
পরের রাতে ঘুমাতে গিয়ে আরো বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। M আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি টের পেয়ে সরে যাই। এ-ও টের পেলাম যে, সে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় ঘুমাচ্ছে। আবারো সে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। মনে হলো সে কিছু চাচ্ছে আমার কাছে। কিন্তু আমার কাছে কেনোরকম সাড়া পাচ্ছে না। এবার আমাকে আকৃষ্ট করার জন্য সে তার সুডৌল স্তন আমার মুখের ওপর চেপে ধরলো। কিন্তু বিবেকের কাছে পরাজিত হয়ে অসামাজিক কিছু করতে পারিনি। তাই বারবার তার ভালোবাসার আবেদনেও সাড়া দিতে পারিনি।
তারপর একটি শব্দ আমার কানে ভেসে এলো, বোকা।
তার এমন আচরণে তার প্রতি একটু দুর্বলতা অনুভব করেছিলাম। সেই দুর্বলতা যে কখন ভালোবাসায় রূপ নিল তা টের পাইনি। তাকে

ভালোবাসতে শুরু করলাম। তবে সে আমাকে ভালোবাসে কি না জানি না। তাকে ভালোবাসার কথা জানানোর মতো দুঃসাহস আমার কখনো হয়নি। নীরবে নিভৃতে তাকে ভালোবেসে যেতে লাগলাম। অর্থাত্ একতরফা ভালোবাসা।
এটাই আমার জন্য কাল হয়ে দাড়ালো। হঠাত্ তার বিয়ে হয়ে গেল। তখন কষ্ট বুকে চেপে রাখলাম। সেই রাতে তার আবেদনে সাড়া দিলে হয়তো সে আমারই হতো। আমি আসলে সত্যিই বোকা।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাথরঘাটা, বরগুনা থেকে

আমও গেল ছালাও গেল

আমার বাস্তব জীবনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা তুলে ধরছি। আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, কৈশোর কাটিয়ে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করছি।
লিপি নামের একটি মেয়ে আমার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লো। সে আমাকে প্রতিদিন ভালোবাসার কথা শোনায়। বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে, নানারকম ভাবভঙ্গি করে আমাকে অনুপ্রাণিত করে, আমার মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভালোবাসাকে জাগ্রত করতে চায়।
কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া পেতো না। এরই মাঝে হঠাত্ একদিন আমার ঘরে ঢুকে আমাকে একা পেয়ে আমার গালে দীর্ঘ একটা

চুমু দিল। আমি অবাক হয়ে গেলাম, আর ভালোলাগার এক অপূর্ব শিহরণ অনুভব করলাম। কারণ এর আগে কখনো আমি মেয়েদের এরকম ভালোবাসার স্পর্শ পাইনি। তারপর সে আমাকেও একটা কিস দিতে বললো, আমি রাজি না থাকা সত্বেও তাকে একটা কিস দিলাম। তার পরের দিনের ঘটনা, আমি বাড়িতে বসে অংক করছি এমন সময় সে আমার ঘরে প্রবেশ করে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো বাড়িতে কাউকে দেখছি না সবাই কোথায়?

আমি বললাম সবাই স্কুলে গেছে আর মা কাকা বাড়িতে গেছে। একথা বলার পর সে আমাকে জড়িয়ে ধরে খাটের ওপর শুয়ে পড়লো। আর বললো আজ তোমাকে আদরে আদরে ভরে দেবো। সে আমাকে অসংখ্য কিস করেছে আর আমিও তার ঠোটে, গালে, চোখে, নাকে, কানে গলায় প্রায় শতাধিক কিস দিয়েছিলাম। সেদিন এর চেয়ে আর বেশি কিছু হয়নি।

এমনিভাবে আমরা যখন সময় পেতাম তখনি ভালোবাসা আদান-প্রদান করতাম। ব্যাপারটা আমার মা টের পেয়ে যান। এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, দিনে আর আমরা কথা বলবো না। আমরা রাতে কথা বলবো।

আমাদের বাড়ি ছিল খুব কাছেই। সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে গভীর রাতে আমরা দেখা করবো। সে যে ঘরে ঘুমাতো সে ঘরে তার মা, বাবা ও ছোট ভাই ঘুমাতো। আমাদের কথা ছিল ঘরের বেড়ায় ২-৩টা টোকা দিলে সে বেরিয়ে আসবে। এভাবেই চলতো ভালোবাসা নামক আমাদের নোংরামি।

লিপির সঙ্গে সম্পর্ক করা অবস্থায় তার ছোট বোনটিকে আমার ভালো লেগে গেল। তার ছোট বোনের নাম স্বর্ণা। তার বয়স তখন ১৪-১৫ বছর। একেবারে টগবগে যৌবন তার সারা শরীরে। যেমন তার ফিগার তেমন গায়ের রঙ ফর্সা, টানাটানা চোখ সব মিলিয়ে সে পরিপূর্ণ একটি মেয়ে। আমি কেন, যে কেউ দেখলে তাকে ভালো লাগবে।

সময় বুঝে একদিন তাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলাম। আর সেও রাজি হয়ে গেল। রাজি না হওয়ার তেমন কোনো বাধা ছিল না, কারণ আল্লাহ আমাকে কোনো অংশে কম দেননি। তার সঙ্গে দেখা করতে হলেও রাতে করতে হতো। সে আর তার ছোট বোন অন্য একটি ঘরে থাকতো। রাতে তার ঘরে টোকা দিলে সে বেরিয়ে আসতো। তবে তার সঙ্গে কথাবার্তা হতো তার ঘরেই। তার ছোট বোন থাকতো ঘুমে অচেতন। এরকম একটা যুবতী মেয়ে আর একটা যুবক ছেলে একঘরে রাতে কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করলে কি হতে পারে সেটা তো বুঝতেই পারছেন। এভাবেই দুবোনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটছিল। এমনি একদিন রাতে আমি ছোট বোনের ঘরে টোকা দেই এই টোকার শব্দ বড় বোনও শুনতে পায়। আমি যখন ছোট বোনকে জড়িয়ে ধরে আছি তখন বড় বোন এসে হাজির। এবার বুঝুন আমার কেমন অবস্থা হয়েছিল।

এরপর তারা দুবোন আমাকে ভণ্ড প্রতারক বলে আমার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করে দিল। আমার মতো এরকম দুবোনের সঙ্গে প্রেম করবেন না। তাহলে আমার মতো ভণ্ড আর প্রতারণার টাইটেল ছাড়া কিছুই পাবেন না। আর বলতে হবে আমার মতো আমও গেল ছালাও গেল।

শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা থেকে

পতেঙ্গা

২৮টা টগবগে বসন্ত আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে - অথচ কাঙ্ক্ষিত মনের মানুষটার দেখা এখনো মেলেনি। জানি না মোর ললাটে কি আছে! তবে তিনি অবশ্যই জানেন - যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।

সে যাই হোক, ভালোবাসা তো শুধু উভয় লিঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়! ভালোবাসাটা মনের ব্যাপার, অনুভূতির ব্যাপার।

আমার পিতৃভূমি সিলেট হলেও চট্টগ্রামের উত্তর পতেঙ্গা আমায় বার বার নাড়া দিয়ে যায়। মনে করিয়ে দেয় হাজারো কথা, ভাসিয়ে নিয়ে যায় শত শত ঘটনাবহুল স্মৃতি তার সাগরে, আমি হারিয়ে যাই সেই পতেঙ্গা। হাউজিং কলোনী, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম এটা শুধু আমার নিবাস ঠিকানা ছিল না। এটা ছিল মাসিক পাঠশালার ঠিকানা, সাহিত্য সংগঠন সৈকত সাহিত্য পরিষদ-এর ঠিকানা, ত্রৈমাসিক ঝলক সাহিত্য পত্রিকার ঠিকানা, ছিল একটি ছাত্র সংগঠনের অস্থায়ী ঠিকানা। না এখন আর এই ঠিকানায় আমি নেই।

১৯৯৯ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার লোকসানের কারণ দেখিয়ে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা বন্ধ করে দেয়।

প্রায় ১৮০০ শ্রমিক-কর্মচারীর সঙ্গে আমাদের বাবাও চাকরি হারান। তাই সরকারি কোয়ার্টার আমাদের ছাড়তে হয়। চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা সাউথ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইস্পাত মিল ছিল। কিন্তু আমাদের এই গৌরবান্বিত সম্পদ ধরে রাখতে পারিনি। স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর কেন একের পর এক মিল-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? নতুন কল-কারখানা নির্মাণ তো দূরে থাক পুরনোগুলো কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে - জাতির বিবেকবানরা একটু চিন্তা করবেন কি?

চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানার কথা যখন ভাবছি তখন স্বাভাবিক কারণে চট্টগ্রাম ইস্পাত কারখানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে যায়। হ্যা এটা আমার প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এর সংক্ষিপ্ত নাম ছিল চ, ই, কা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আর অন্য স্কুলের ছেলেরা দুষ্টুমি করে বলতো- চড়–ই, ইদুর, কাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এখন এসব কথা মনে হলে হাসি আর তখন তো মারামারি পর্যন্ত করেছি। দীর্ঘ ১২ বছর তথা এক যুগ পরও এই বিদ্যালয়কে আমি ভুলতে পারিনি, ওকে আমি গভীরভাবে ভালোবাসি। এখনো ভালোবাসি আমার সেই প্রিয় শিক্ষকদের যারা আমাকে মানুষ হওয়ার তন্ত্রমন্ত্র শিখিয়েছেন। জাফর স্যার। ইংরেজি ডিকশনারির যিনি পোকা ছিলেন। এমন কোনো ক্লাস

বাদ পড়েনি তার হাতের মার থেকে। মেরে মেরে English Vocabolary যা শিখিয়েছেন তা আজ ইংল্যান্ডে এসে আমার কাজে লাগছে। ঠিক তেমনি হাতে-কলমে শিখিয়েছেন-মোস্তফা কামাল স্যার, হক স্যার, মহসিন স্যার, জেরিনা ম্যাডাম, আজিজ স্যার, ওমর স্যার, আহমদ ছফা স্যার, পিটি স্যার, আনোয়ার স্যারসহ সব শিক্ষক-শিক্ষিকা। আজ আমার প্রিয় শিক্ষকমণ্ডলীকে জানাই সালাম ও কদমবুচি। সেই সঙ্গে আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী তাহের, হায়াত মাহমুদ, বেলাল, অরূপ রতন, শাহাবুদ্দিন, অহিদ, সিরাজ, ইসমাইল, রিয়াদ, শামীম, মাসুদ, ঝর্না, শিউলি, চুমকি সবার প্রতি রইলো লাল গোলাপের সঙ্গে একরাশ ভালোবাসা। তোরা আমারটা ফেরত দিস কিন্তু!

পতেঙ্গার কথা উঠলে বঙ্গোপসাগরের কথা না বললে যে তৃষ্ণাই মিটবে না। সাগরের সঙ্গে মিতালী করতে কার না ভালো লাগে। আমি বর্তমানে ইংল্যান্ডে ব্রাইটন সিটিতে কর্মরত। ইংলিশ চ্যানেলের তীরে অবস্থিত ব্রাইটন সিটি। সুযোগ পেলেই আমি ইংলিশ চ্যানেলের কাছে ছুটে যাই। তার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের কাছে এসএমএস পাঠাতে থাকি। বঙ্গোপসাগরও আমাকে অনেক কথা বলে। জানেন সে কি বলে - কেন তার কাছে যাই না, কেন আমি এতো বড় নিষ্ঠুর এ জাতীয় প্রশ্ন করে। তবে আমার তখন খুব ভালো লাগে। অন্তত আমার প্রিয় সাগর তো আমাকে মনে রেখেছে। আমার জন্য অপেক্ষায় প্রহর গুনছে।

আচ্ছা এই বঙ্গোপসাগরকে আমি এতোদিন পরও মনে রেখেছি -তবে কি এটাকেই ভালোবাসা বলে!

ছোটও ছোটও ঢেউ তুলি পানি
লুসাই পাহাড় উরততুন নামি
যারগই কর্ণফুলী

হ্যা, কর্ণফুলীর পাড়ে পাড়ে সাড়ে সাত হাজার মাইল দূর হতে এখনো আমি ঘুরি নিরন্তর। তবে সবচেয়ে ভালো লাগতো যখন কর্ণফুলী আর সাগরের মোহনায় দাড়াতাম। ওদের পারস্পরিক আলিঙ্গন আমাকে বিমোহিত করতো। একটা ছোট্ট নদী বিরাট সাগরের সঙ্গে মিতালী করে-সাগরেরও কোনো অহঙ্কার নেই সেই মিতালীতে। যতোসব অহঙ্কার আমাদের মানুষের মাঝে সীমাবদ্ধ। এটা দূর করা উচিত।

স্টিলমিল বাজার, কাঠগড়, ২নং বাস কতো কিছুই মনে পড়ছে। সবকিছু বলতে গেলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে আর যাযাদিও গায়ে-গতরে বড় হয়ে যাবে। ম্লমি এ দুনিয়ায় ম্লমি থাকাই ভালো। আগামী ভালোবাসা দিবসে না হয় বাকি কথা বলবো। এর মধ্যে হয়তো আমার মনের মানুষের খবরও পেয়ে যেতে পারেন। সবই ওই ওপরওয়ালার ইচ্ছা!

কলিংউড স্ট্রট, লন্ডন থেকে
armilon79@msn.com

কটকাতে

ডিসেম্বর ২০০৩-এ আমার প্রথম ক্লাস শুরু হয়েছিল। নতুন জায়গায় এসেছি। কার সঙ্গে কথা বলবো, কি বলবো বুঝতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে পরিচিত হলাম। কিছুদিন যেতেই আমাদের ফার্স্ট ইয়ারদের জন্য টুর অ্যারেঞ্জও করা হলো। স্থান কটকা সমুদ্র তীর। সবাই মিলে যাবো ভাবতেই মনটা নেচে উঠলো। ১৩ মার্চ, আমরা কটকা পৌছলাম। সমুদ্রের মতোই যেন প্রাণচঞ্চল সবাই। বিভিন্ন ইয়ারের আমরা প্রায় শখানেক ছাত্রছাত্রী ছিলাম। বেলা তখন একটা, অনেকেই নেমে গেছে সমুদ্রে। ঠিক এই সময় সে আমাকে ডাকলো, বললো, জরুরি কথা আছে।

বললাম, ঠিক আছে বলো।

ও বললো, চলো হাটতে হাটতে বলি।

আমরা হাটতে লাগলাম সমুদ্রের তীর ধরে। ও তখন বলা শুরু করেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সে যা বললো তার সারমর্ম হলো সে আমাকে ভালোবাসে। আমার জবাব যদি নাও হয় তাহলেও তার কোনো সমস্যা নেই, ও একাই ভালোবেসে যাবে।

ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন সিনেমার মতো মনে হলো। মনে মনে হাসলাম এবং নেগেটিভ উত্তর দিলাম।

ও কিন্তু তখন একদম চুপ। আমরা আরো কিছুক্ষণ হাটলাম।

হঠাত্ চিৎকার শুনে পেছনে ফিরে দেখি আমাদের অনেকে জোরে জোরে কাদছে।

দৌড়ে কাছে এসে শুনি আমাদের সঙ্গে আসা আপু ভাইয়াদের অনেকেই নাকি ভেসে গেছে। যারা সাতার জানতো তারা ভেসে যাওয়া বেশ কয়েকজনকে তুলে আনতে পারলেও নয়জন ভাইয়া ততোক্ষণে গভীর সমুদ্রে চলে গেছেন। তুলে আনাদের মধ্যে একজন সমুদ্রের তীরে এবং একজন লঞ্চে মারা যান। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সবাই স্তব্ধ। একদিন আগেও আমরা যেখানে হইচই করছিলাম সেখানে আজ সবাই একদম চুপচাপ।

একদিন পর বাকি নয়জনের লাশ উদ্ধার হয়।

এ ঘটনার পর আমাদের সবার স্বাভাবিক হতে বেশ সময় লেগেছিল। কেননা এতো কাছ থেকে এতোগুলো মৃত্যু আমরা কখনো দেখিনি। সে আগে আমার সঙ্গে ভালো আচরণ করলেও তখন আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করে।

তার এই ব্যবহারই যেন আমাকে পাগল করে তোলে। একসময় অনুভব করি ভালোবাসতে শুরু করেছি তাকে।

ডাকলাম।
মনের কথা বললাম।
অনেক মান-অভিমান শেষে শুরু হলো আমাদের একসঙ্গে পথচলা। অনেক ভালোবাসা, অনেক ঝগড়ার মধ্যে পেরিয়ে গেছে আড়াই বছর। ভালোবাসা কমেনি এতোটুকুও। আল্লাহপাক বাচিয়ে রাখলে আমরা দুজনেই ভবিষ্যতে স্থপতি হবো সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়তে চাই আমার আর তার একটা ছোট্ট স্বপ্নের ভুবন।
তবে কখনোই ভুলবো না কটকাতে সেই দিনটির কথা।
খুলনা থেকে

উপলব্ধি

সময় চলছে সময়ের নিয়মে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরাও ছুটছি সবাই। কিন্তু আমাদের ভেতরে ভর করেছে একরাশ অস্থিরতা। আর এ অস্থিরতা আমাদের দিক জ্ঞানশূন্য করে তুলছে। তাই বন্ধুত্ব, স্নেহ, ভক্তি, আসক্তি, শ্রদ্ধা-ভালোবাসাকে যে অর্থেই যুক্ত করি না কেন আমাদের ভেতর থেকে একে একে হারিয়ে যাচ্ছে সব সূক্ষ্ম অনুভূতি অথবা আমরা আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে রাখতে পারছি না।
স্বার্থের বলিকাষ্ঠে আমরা নিজেদের এতোটাই বিসর্জন দিয়েছি যে, আমরা সহ্য করতে পারি না আমাদের সহকর্মীকে, আমরা সামান্য কারণে আঘাত করি আমাদেরই সহোদরকে, আমরা ভুলে যাই আমাদের সন্তানের প্রতি মমত্ব, আমরা ভুলে যাই আমাদের মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসা।
ভালোবাসা মানে সমঝোতা, ভালোবাসা মানে বোঝার ক্ষমতা বাড়ানো, ভালোবাসা মানে নিজ স্বার্থকে উপেক্ষা করে অন্যের মঙ্গল কামনা করা, ভালোবাসা মানে একে অপরের হাত ধরা-ধরি করে চলা। আমরা হয়তো হাত ধরা-ধরি করে কেউ কেউ চলছি কিন্তু মন নামক যে সত্তাকে আমরা উপলব্ধি করি তাহলে তাকে কেন স্পর্শ করতে পারছি না? কেন হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের ভেতর থেকে উপলব্ধির গভীরতা? ভালোবেসে কেন আমরা একে অপরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না? অস্থির এ যুগে আমরা নিজেরাই তো বিশ্বস্ত করে তুলতে পারছি না নিজেকে।
আবদুল্লাহ আবু সাঈদ সাদা মনের মানুষের যে বর্ণনা দিয়েছেন - নিজের স্বার্থের ক্ষেত্রে যে বোকা, যে অন্যের স্বার্থ, সুখ-দুঃখ খেয়াল করবে সেই সাদা মনের মানুষ। তাহলে আমরা কেন আমাদের মনের ক্যানভাসটাকে সাদা বানানোর চেষ্টা করি না। তাহলেই তো তাতে ভালোবাসার রঙ দিয়ে আকতে পারবো মনের মাধুরী মেশানো ছবি। যে ছবিতে ফুটে উঠবে বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতি, পাহাড়, নদী, অরণ্য। ফুটে উঠবে দুঃখ-কষ্টে নিমগ্ন সাধারণ মানুষের ছবি। ফুটে উঠবে সুখী সমৃদ্ধ আমাদের এ দেশ। যে ছবিতে ঠাই পাবে না ব্যক্তি স্বার্থ, মারামারি, কাটাকাটি। যে ছবি মুক্ত থাকবে সব কুটিলতা থেকে। তাই আজ আমাদের সাদা মনের মানুষ হওয়া বড় বেশি প্রয়োজন। তার জন্য প্রয়োজন ভালোবাসতে পারা। যতো বেশি ভালোবাসতে পারবো ততো বেশি ভালোবাসা পেতে পারবো। কারণ ভালোবাসাই ভালোবাসার সৃষ্টি করে।
ভালোবাসার বোধ শুধু একজন নর ও একজন নারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, আসুন এ ধারণা থেকে বেরিয়ে আসি। এর অনুভূতি প্রয়োজন জীবনের সর্বক্ষেত্রে। আমাদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই পারে এ বোধের জন্ম দিতে। এ বোধ যেন প্রতিনিয়ত জাগ্রত থেকে আমাদের ভেতর সৃষ্টি করে শুভ চেতনার। এই শুভ চেতনা জাগিয়ে দেবে একটি শুভ প্রজন্মকে, একটি শুভ প্রজন্ম জাগিয়ে দেবে সমাজকে, দেশকে।
আসুন বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আমরা ভালোবাসাকে উপলব্ধি করি। ভালোবেসে ভালোবাসাকে বাচিয়ে রাখি। যেখানে ভালোবাসা সেখানে অকল্যাণ প্রবেশ করতে পারে না। মঙ্গল প্রদীপের জন্য, সুন্দর সকালের জন্য, দেশের কল্যাণের জন্য আমরা আগে ভালোবাসতে শিখি, ভালোবাসার পরিবেশ তৈরি করি, তাহলেই ভালোবাসা পেতে কষ্ট হবে না।
আসুন বয়স, স্থান, কালের মধ্যে ভালোবাসাকে আটকে না রেখে একে করে তুলি সর্বজনীন। ভালোবাসার গভীরতাকে সবাই উপলব্ধি করি। ভালোবাসা দিবসে আমাদের সবার ভেতরে জন্ম হোক এক নতুন অঙ্গীকারের, ভালোবাসতেই চাই, ভালোবাসা চাই।
আজিমপুর, ঢাকা থেকে

ওপেন হার্ট সার্জারি

ও ডাক্তার, আপনি যখন করবেন আমার ওপেন হার্ট সার্জারি, দেখবেন হার্টের মাঝখানে এক মেয়ে রূপসী ভারি। ছুরি, কাচি, সুইয়ের খোচা তার যেন না লাগে। আমার জীবন-মরণ পরে তার জীবনটা আগে গো ডাক্তার।
কুমার বিশ্বজিতের জনপ্রিয় এ গানের পঙক্তি যদি সত্যি বাস্তব হয়ে যায় কেমন হয় বলুন তো? গানটির মতোই ভালোবাসার প্রকৃত রূপ,

প্রতি বছর ভ্যালেনটাইনস ডে-তে যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যার পাতা জুড়ে থাকে অসংখ্য লেখকের বুকভাঙা হাহাকার আর ভালোবাসা। অশ্রুসজল নেত্রে অবাক হয়ে পড়ি ভালোবাসার সেই সাফল্য বা ব্যর্থতার কাব্যগুলো। আসল কথা হলো, জীবনে যা কিছু মূল্যবান তার জন্য মানুষকে চরম মূল্য দিতে হয়, পাড়ি দিতে হয় দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ পথ- হয়তো কোথাও কোথাও স্বর্ণালি সূর্য হাসে, কোথাওবা রাতের অন্ধকার চিরতরে আসীন হয় জীবনে। নারী, টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, ভাগ্য, ভালোবাসা এর থেকে আলাদা কিছু নয়।

কুমার বিশ্বজিতের উপরোক্ত গানটির কথাই ভাবুন। ওপেন হার্ট সার্জারি মানে হৃদয়ের শল্য। আসলে হার্ট বা হৃদয় কিন্তু ভিন্ন, অন্তত মেডিকাল সায়েন্সের মতে হার্ট হলো আমাদের বক্ষপিঞ্জরে অবস্থিত একটি অরগান (Organ), যা ক্রমাগত

সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটিয়ে আমাদের সারা শরীরে রক্ত প্রবাহ, পুষ্টি সাধন করে। ভাবতে অবাক লাগে প্রতি মিনিটে হার্ট ৭০-৮০ বার সঙ্কুচিত হয় এবং প্রায় পাচ লিটার রক্ত পাম্প করে (ওই গানের মতো, একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইড়া...) আর হৃদয় আক্ষরিক অর্থে অদৃশ্য হলেও বিজ্ঞানীরা আজকাল মানব মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমে এর অস্তিত্ব খুজে পেয়েছেন। যা ভালোবাসা, মানবিক ও জৈবিক গুণাবলীর অপূরব সংমিশ্রণ ঘটিয়ে বংশবিস্তার ও খাদ্য গ্রহণে মানুষের আচরণ ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

আর ভালোবাসায় আঘাত পেলে যে গলাব্যথা, বুকের কষ্ট আসিফের গানটির ভাষায় বুকের জমানো ব্যথা কষ্টের লোনাজলে ঢেউ ভাঙে চোখের নদীতে- সে তো এই লিম্বিক সিস্টেম আর মস্তিষ্কের জটিল স্নায়ুজাত ক্রিয়া-বিক্রিয়া, নিউরো ট্রান্সমিটার কেমিকাল মেডিয়েটর বাহিত প্রতিক্রিয়া মাত্র। ফিরে আসি ওপেন হার্ট সার্জারিতে। আজকাল জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, হার্ট ফাউন্ডেশন, ল্যাব এইড, অ্যাপোলো বা সদ্য গঠিত ইউনাইটেড হসপিটালের কল্যাণে খুব সহজে স্বল্প খরচেই সাফল্যজনকভাবে ওপেন হার্ট সার্জারি বাংলাদেশে হচ্ছে। শুধু বাইপাস সার্জারি নয়, ভাল্ব সার্জারি, হৃৎপণ্ডের ফুটো থেকে জটিল জন্মগত হৃদরোগের সার্জারি আজকাল ডাল-ভাতের মতো আমাদের দেশে।

যদি রোগীর শারীরিক অবস্থা অপারেশনের উপযোগী থাকে ওপেন হার্ট সার্জারি অন্যান্য সার্জারি থেকে শুধু আলাদা নয়, বিস্ময়কর ও কৌতূহলপ্রদও বটে। এতে এক ধরনের ইলেকট্রক এবং গ্যাসযুক্ত করাত দিয়ে বুকের মাঝখানে স্টারনাম (Sternum)-এর মাঝ বরাবর কাটা হয়। এরপর Aortic, Venous Canulations করে হার্ট এবং লাংস (ফুসফুস) দুটিকে বন্ধ করা হয়। হার্টকে বিশেষভাবে তৈরি Cardioplegia নামে কেমিকালস দিয়ে বন্ধ করা হয় এবং বরফের টুকরা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। হার্ট লাংস মেশিন নামে খ্যাত কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস মেশিন-এর সঙ্গে রোগীর aorta ও SVC, IVC সংযোগ করা হয় এই মেশিন অপারেশনকালে হার্ট এবং লাংসের বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এতে Resirvour Oxygenator, Heat Exchanger ও Artesial filter ব্যবহৃত হয়। Oxy genator Vein-এর দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করে Lung-এর কাজ করে। এই মেশিনটি তিনটি Centrifugal roller Pump-এর সাহায্যে হার্টের মতো রক্তকে পাম্প করে। ইত্যবসরে আমাদের দেশের সোনার ছেলে কার্ডিয়াক সার্জনরা পা ও বুক থেকে Artery ও Vein তুলে নিয়ে হার্টের বাইপাস সার্জারি করেন। একইভাবে এই মেশিন use করে Atrial Septal defect, valvular surgery, কৃত্রিম বাল্ব স্থাপন, Ventricular Septal defect, TOF, TGA সহ অন্যান্য জটিল হৃদরোগের সার্জারি করা হয়। অপারেশন শেষে এই মেশিন থেকে Wean করে হার্ট ও Lung কে আবার সচল করা হয়। অবশেষে পারফিউশানিস্ট, অ্যানেসথেটিস্ট ও কার্ডিয়াক সার্জনদের যৌথ প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয় একেকটি সাফল্যজনক অস্ত্রোপচার।

অপারেশনকালে আমাদের শ্রদ্ধেয় কার্ডিয়াক সার্জন স্যারদের হাতের নিপুণ শৈল্পিকতা দেখে মনে পড়ে সেই গানটি, তোমায় আপন হাতের দোলায় দুলে আমার এই হৃদয়। এই দীর্ঘমেয়াদি সার্জারির পরও আছে ভোগান্তি। আমাদের ICU- তে ওই রোগীদের নিয়ে অপারেশন পরবর্তী বিভিন্ন দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয় সুনিপুণ যথাযথ চিকিৎসা দিয়ে। অপারেশনের ঘণ্টা কয়েক পরে Extubation করে যখন রোগী আর আত্মীয়-স্বজনের হাস্যোজ্জ্বল মুখটা দেখি ভুলে যাই পথের ক্লান্তি, নিদ্রাহীনতা, অনাহার আর অমানুষিক পরিশ্রমকে। মনে পড়ে যায় চিরায়ত সেই অমর বাণী- ভালোবাসার জয় অবশ্যম্ভাবী। মানব হৃদয় বা হার্ট আবারো স্বাভাবিক ক্রিয়াকর্মে ব্যাপৃত হয়, দীর্ঘতর হয় মানুষের সুখী সুস্থ জীবন আর ভালোবাসা। সার্থক হয় কবিগুরুর সেই অমর উক্তি-
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানুষের মাঝে আমি বাচিবারে চাই।
জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট, ঢাকা থেকে

হাসিনা

তুষার হাতের সিগারেটটি হঠাত্ পায়ের তলায় পিষে ফেললো। পাশে দাড়িয়ে থাকা বন্ধু বললো কি হলো, তুষার বললো দেখছিস না বাবা আসছে। বাবা জানে আমি সিগারেট খাই তাই বলে তার সামনে প্রকাশ্যে খাওয়া তো ঠিক নয়। বাবা চলে যাওয়ার পর তুষার আরেকটি সিগারেট মুখে নিল, দিয়াশলাই দিয়ে আগুন জালানোর আগেই মুখ থেকে সিগারেট সরিয়ে ফেললো। কারণ যার অপেক্ষায় দাড়িয়ে থাকা, যার ভাবনায় সময় কাটানোর জন্য মুখে সিগারেট সেই কাঙ্ক্ষিত মানুষটি আসছে।
কাছে এসেই হাসিনা বললো, তোমার হাতে দিয়াশলাই কেন?
তুষার বললো, সাব্বির আমার কাছে দিয়াশলাই রেখে ওদিকে গেছে।
হাসিনা বললো, দেখো তুষার আমি চাই না তুমি ধূমপান করো। আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমাকে পেতে হলে তোমাকে ধূমপান ছাড়তে হবে। হয় তুমি আমাকে ভালোবাস, নয় তো ধূমপান করো।
তুষার বললো, এই তোমাকে ছুয়ে বলছি আর সিগারেট খাবো না।
একদিন হাসিনা নিমন্ত্রণ করলো তুষারকে। তুষার বাড়ি গেল, হাসিনা তুষারকে পেয়ে মহাখুশি। ফাকা বাড়ি দেখে তুষার বললো, বাসার অন্য সবাই কোথায়?
হাসিনা বললো, বাবা-মা আজ বাড়ি নেই তাই তোমাকে আসতে বললাম। আজ তোমাকে আমি রান্না করে খাওয়াবো।
রান্নার কাজে হাসিনাকে সাহায্য করলো তুষার। রান্না শেষে হাসিনা গোসল সেরে টেবিলে খাবার দিল। তুষার রান্নার প্রশংসা করলো। খাওয়া শেষে তুষার বিছানায় শুয়ে টিভি দেখছে। হাসিনা কাজ শেষে তুষারের পাশে বসলো। ফ্যানের বাতাসে হাসিনার চুলগুলো উড়ে পড়ছে তুষারের মুখে। তুষার হাসিনাকে কাছে টেনে নিল। ঠোটে একে দিল সুমধুর চুম্বন।
তুষার ও হাসিনার ভালোবাসা ছিল নিখাদ। একদিন হাসিনা ও তুষারকে একই রিকশায় দেখে ফেলে তুষারের বাবা। তুষার রাতে বাসায় এলে বাবা জানতে চায় তোমার সঙ্গে মেয়েটি কে?
বললো বান্ধবী।
তুমি তাকে ভালোবাস?
হ্যা। বাবা তুষারের বিয়ের আয়োজন করলো। বিয়ের সব আয়োজন শেষ; কিন্তু বাধ সাধলো নাম। বাবা কিছুতেই হাসিনা নামের মেয়ের সঙ্গে তুষারের বিয়ে দেবে না। বাবার ধারণা, হাসিনা নামের মেয়েরা আওয়ামী লীগ নেত্রীর মতো মুখে যা আসে তাই বলে। সব কাজেই না না বলা স্বভাব। ঝগড়াটে এবং স্বামীর কথা শোনে না। তাই জেনেশুনে এ নামের মেয়েকে তুষারের বউ বানাতে নারাজ। সবার বুঝানোতে বাবা রাজি হলো, তবে নাম পাল্টাতে হবে। অবশেষে বিয়ে সম্পন্ন হলো।
হাসিনা কথা ও আচার-আচরণে জয় করে নিল সবাইকে। বাবা তো কথায় কথায় বউমা বউমা বলে অস্থির।
হাসিনা বাবাকে বলে, বাবা আওয়ামী লীগ নেত্রীর মতো সব হাসিনাই একরকম নয়। বাবা খুশি হয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলে নতুন নামে নয়, মা আমিও তোকে হাসিনা বলেই ডাকবো।
সত্যিই তো ভালোবাসায় কি না হয়।
জিয়া মার্কেট, ভোলা থেকে

একজন রিকশাচালক

১২ নভেম্বর ২০০৬ থেকে ১৪ দল কর্তৃক লাগাতার অবরোধ শুরু হয়। তাই আমার মতো আরো অনেককেই ১১ নভেম্বর চাকরির স্থলে পৌছতে হবে। সাধারণত সিলেটে রিকশা পাওয়া বেশ কঠিন। অনেক সময় অপেক্ষা করার পর একজন রিকশাচালক জিজ্ঞাসা করলো কোথায় যাবো?

বললাম, কদমতলী বাস টার্মিনাল।

সে রাজি হলো। তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলাম।

বাড়ি হবিগঞ্জ, তার আয় ২০০-২৫০ টাকা প্রতিদিন। তবুও এই আয়ে তার সংসার চলে না। ঘরভাড়া ১,৮০০ টাকা।

বললাম, আমাদের নেত্রী ও নেতাদের আয় কোটি টাকা। তাদেরও সেই আয়ে হয় না।

সে জিজ্ঞাসা করলো, আমার বাড়ি কোথায়? কি করি, বিয়ে করেছি কি না।

উত্তরে বললাম, বিয়ে করিনি।

সে বললো, ভালোবেসেছেন নিশ্চয়ই।

আমি না বললাম।

সে বললো আপনি মিথ্যা বলছেন।

বললাম, আমি মিথ্যা কথা বলি না।

তাহলে মেয়েরা আপনাকে ভালোবেসেছে?

বললাম, কিভাবে বুঝলে?

বললো, আপনার চেহারা দেখলেই তো হলো।

জানি না, তাছাড়া এ রকম কোনো প্রমাণ এখনো পাইনি।

কথা বলতে বলতে কিন বৃজে চলে এলাম। একজন ঠেলারিকশা ঠেলা শুরু করলো।

রিকশাচালক জিজ্ঞাসা করলো, তোমার বাড়ি কোথায়, এখানে নতুন কি না?

সে বললো, আমি এখানে নতুন এসেছি। বাড়ি বিয়ানীবাজার।

তুমি রিকশা চালালেও তো পার, এখানে রিকশা চালালে আয় অনেক হয়।

তুমি যদি রাজি হও তাহলে আমার চারটা রিকশা থেকে একটা তোমাকে চালাতে দেবো।

সে রাজি হলো।

রিকশাচালক বললো, একজন ঠেলা যেন রিকশা চালায় অথবা একজন রিকশাচালক যেন বেবিট্যাক্সি চালায় আমি তা চাই। একজন রিকশাচালক যেন সব সময় রিকশা না চালায় আমি তা চাই। সবাই যেন তার বর্তমান অবস্থা থেকে সামনে যেতে পারে আমি তা চিন্তা করি।

আমি তার পজিটিভ চিন্তাধারা থেকে বেশ ইমপ্রেসড বোধ করলাম। ভাবলাম, আমাদের রাজনীতিবিদ অথবা বুদ্ধিজীবীরা কি তার মতো চিন্তা করছে! দেখতে দেখতে আমার গন্তব্যে পৌছলাম।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে তাকে বললাম, তোমার চিন্তা বাস্তবায়ন হোক এই দোয়া করি।

নাম ঠিকানাবিহীন
plazma_state@yahoo.co.in

রাসায়নিক

প্রিয় সোডিয়াম থায়োসালফেট,

প্রথমেই তোমাকে দেড় টন মিথিলিন ডাই-অক্সাইডের শুভেচ্ছা।

পর সমাচার এই যে, তোমার কাছ থেকে প্রাপ্ত আর্গনের মতো আচরণে আমি খুবই বেদনাহত। তুমি আমার হৃদয়ের সর্বশেষ কক্ষপথের আবর্তন পূর্ণ হওয়ায় বিক্রিয়াহীন। আর এদিকে তোমাকে হারিয়ে আমার হৃদয়ের জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া প্রায় স্থির হয়ে গেছে। আমার হৃদয়ের টেস্টটিউবে তোমাকে করছিলাম কানায় কানায় পূর্ণ। আর আজ আমার ভাবনাটা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। আমার ভালোবাসার বিস্তৃতি ছিল অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার মতো বিশাল এবং আইনস্টাইনের $E=mc^2$ সমীকরণের মতো শক্তিশালী। এরপরও আমি তোমার কাছে বার্জেলিয়াসের প্রাণশক্তির মতো গুরুত্বহীন। এখন আমার হৃদয়ে নিউক্লিয়াসের সব অক্সিজেন পুড়ে জন্ম নিয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং কার্বন মনো-অক্সাইড। মাঝে মাঝে ভাবি, আমি শুধু তোমার বাইরের গোল্ডের মতো রূপটিই দেখেছি, দেখিনি হাইড্রোজেন থায়োসালফাইড গ্যাসের মতো দুর্গন্ধযুক্ত কলুষিত ডাইনি হৃদয়।

আজ আর নয়। কারণ মুখের অম্ল ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ এবং পানিতে পরিণত হয়েছে। অবশেষে লবণাক্ত পানির নোনতা ভলোবাসা জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

ইতি
নিঃসঙ্গ ক্লোরিন।
পূর্ব জুরাইন, ঢাকা থেকে
djuice@acasa.ro

পুলিপিঠা

আমরা ছিলাম প্রথমে শুধু বন্ধু। যদিও সে আমার চেয়ে দুই বছরের সিনিয়র তবু বন্ধু হিসেবে সে ছিল খুবই ভালো। আমি দেখতে সুন্দর না হলেও আজ পর্যন্ত যতো ছেলের সঙ্গে একটু মিশেছি তারাই অফার করে বসতো। সেসব অভিজ্ঞতার জন্য আমাদের বন্ধুত্বের প্রথমেই আমি বলেছিলাম, এক শর্তে আমি ফ্রেন্ডশিপ করবো।

পুলি পিঠা বললো, কি শর্ত?

আমরা শুধুই ফ্রেন্ড থাকবো, এর চেয়ে বেশি যাওয়ার চেষ্টা করবে না।

আমি অতোটা খারাপ না। তার পর থেকে বন্ধুত্ব শুরু। বন্ধু হলেও আমরা অনেক ঘুরতাম।

এভাবেই যাচ্ছিল দিনগুলো। কিন্তু পুলিপিঠা হঠাত্ অফার করে বসলো। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম আর ভাবলাম, এ কি অবস্থা।

ও বললো, যদি কিছু না বলে চলে যাও তাহলে ভাববো তুমি রাজি না।

আমিও যথারীতি চুপ করে চলে এলাম। তারপর তো ভয়াবহ অবস্থা। বিভিন্নভাবে খবর পেলাম তার কীর্তি-কলাপের, যা আমি সহ্য করতে পারলাম না। সে খারাপ পথে যাক আমি তা ভাবতেও পারতাম না। আর তখনই বুঝলাম আমিও ভালোবেসে ফেলেছি। যদি না-ই বাসবো তাহলে তার অধঃপতন কেন আমার রাতের ঘুম হারাম করতো! কেন কষ্ট দিতো আমাকে! তারপর যা হওয়ার তাই। কঠিন মন বলে খ্যাত এ মনটা ওর ভালোবাসার কাছে হেরে গেল।

একদিন আমরা গেলাম আশুলিয়ায়। হঠাত্ করেই পুলিপিঠা বললো, আমি এখন তোমার হাতটা একটু ধরবো।

বললাম, কেন?

খুব ইচ্ছা করছে।

কেন এতো ইচ্ছা করে?

জানি না।

তারপর হাত ধরলো। কিছুক্ষণ পর টের পেলাম, ওর হাত ঘামছে। দুই হাতই ঘামতে লাগলো। বললাম, আপনার হাত ঘামছে। এই প্রথম সে আমার হাত ধরেছে। আমি বললাম, কি হয়েছে, হাত ঘামছে যে?

ও বললো, কিছু হয়নি, তোমার সঙ্গে প্রথম যেদিন কথা বলি সেদিনও আমার হাত ঘামছিল। আজো ঘামছে। মনে হয় বেশি নার্ভাস হলে আমার হাত-পা ঘামে।

আমি বললাম, ঘামা ভালো। এর পর থেকে কোনো সাহসের কথা উঠলেই বলি, হ্যা, তোমার অনেক সাহস। এতোই সাহস যে হাত-পা ঘামে। সত্যিই ও খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সেদিন।

এই ভালোবাসা দিবস আমাদের সম্পর্কের পর প্রথম। আর তাই তোমাকে আমার প্রিয় যাযাদি-র মাধ্যমে বলছি, আমার নার্ভাস পুলিপিঠা, ভালোবাসি তোমায়।

ঠিকানাবিহীন

নীরব কষ্ট

পৃথিবীতে আমি আমার স্বামী জীবনকে খুব বেশি ভালোবাসি। জীবনও আমাকে খুব বেশি ভালোবাসে। জীবন আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। সম্পর্কের শুরুটা ছিল খুব সুন্দর। জীবনের সুন্দর সময়গুলো হাসি-খুশি-আনন্দেই পার করছিলাম। দাম্পত্য জীবনে মান-অভিমান, ভুল বোঝাবুঝি, রাগারাগি থাকবেই। এসব ব্যাপার ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করবো আশা করেছিলাম। ভাবতাম ভালোবাসা দিয়ে স্বামীর কঠিন রাগকে তরলে পরিণত করবো। কিন্তু তা আর আমার দ্বারা সম্ভব হলো না। অনেক চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, মনের জমানো কষ্টগুলো আর কখনো প্রকাশ করবো না। কিন্তু আজ আর না বলে পারছি না- জীবন, তুমি একটিবার ভেবে দেখো কতোটুকু কষ্ট আমার বুকে জমে আছে?

সম্পর্কের শুরুতে ভালোবেসে আমাকে একটি নাম দিয়েছিলে। অনেক আদর মমতা ভালোবাসা নিয়ে সেই ভালোবাসার নাম ধরে আমাকে তুমি ডাকতে। কিন্তু এখন আর সেই নাম ধরে ডাকার কোনো প্রয়োজন মনে করছো না। সিদ্ধান্ত নিয়েছো কখনো কোনোদিন আমাকে চিঠি

লিখবে না। বলে দিয়েছো তোমাকে যেন কখনো কোনোদিন কিছু গিফট না করি। তুমি আরো সিদ্ধান্ত নিয়েছো, কোনো বিশেষ দিনে, কোনো উৎসবে, আমাদের বিয়েবার্ষিকী, বার্থডেতে আমাকে নিয়ে কোনো আনন্দ করবে না।
বর্তমান যুগটা হচ্ছে মোবাইলের যুগ। এ মোবাইলের যুগে বাস করেও তোমার সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ হয় খুব কম। কিছুদিন আগে একটি ব্যাপারে খুব বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম। আমি এতোটাই আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, তোমাকে যে কিছু জিজ্ঞাসা করবো সে ভাষাটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলাম। জীবন, তুমি নতুন সিম ব্যবহার করছো আর বউ হয়ে আমি তা জানতে পারিনি- এ ব্যাপারটি আমার যতোবার মনে হয়েছে ততোবারই আমি মানসিক যন্ত্রণায় ভুগেছি। তোমাকে আমি কোনো দোষ দিচ্ছি না। ব্যবসার খাতিরে তোমার অনেক সিমের প্রয়োজন পড়তে পারে। কতোটুকু কষ্ট যে আমি পেয়েছি তা আর তোমাকে বোঝাতে চাই না। কারণ এ কষ্টটুকু বোঝার মতো মন তোমার নেই।
এক জীবনে মানুষের কি-ইবা চাওয়ার থাকে! তোমার কাছে আমার বড় কোনো চাওয়ার ছিল না। ভেবেছিলাম মনের সুখে সুখী হব। তোমার মতে, আমার প্রতি তোমার ভালোবাসার কমতি নেই এবং দায়িত্ব এবং কর্তব্যেও অবহেলা করছো না। জীবন, আমি তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসি। কোনো কারণে আমি তোমার অসম্মান করতে চাই না। কিন্তু যে চাপা কষ্টগুলো আমার বুকে জমে আছে, আজ প্রকাশ করে নিজেকে একটু হালকা করলাম।
বাঙালি মেয়েদের জীবনে স্বামীরাই তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একটুখানি আদর, মমতা, ভালোবাসা পাওয়ার আশায় তাদের মুখ পানে চেয়ে থাকে। জীবনের স্বপ্ন, আশাগুলো একমাত্র তাকে ঘিরেই। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। তাই আজ বলছি- সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব, মান-অভিমান ঝেড়ে ফেলে জীবনটাকে একটু সুন্দরভাবে সাজাও। যেখানে কোনো দুঃখ থাকবে না, কোনো কষ্ট থাকবে না- থাকবে শুধুই ভালোবাসা।
নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

খোলা চিঠি

কাটুস পিটিসের বাবা
কেমন আছো? এক সময় আমরা একে অপরকে অনেক চিঠি লিখেছি তাই না? সেদিন সব চিঠিগুলো একসঙ্গে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলাম আর পড়ছিলাম। প্রথমে তোমার চিঠিগুলো পড়তে পড়তে মনে হলো, কি অসাধারণ চিঠিই না তুমি লিখতে। এরপর আমার চিঠিগুলো পড়তে যেয়ে মনে হলো, তোমার চিঠিগুলোর চেয়ে আমারগুলোই অনেক বেশি সুন্দর। কি রাগ করলে? তোমার চিঠির এক জায়গায় তুমি লিখেছিলে, একদিন সিঙ্গাপুরে তুমি একটা পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলে, সেখানে দেখলে এক দম্পতি তাদের ৬ বাচ্চা নিয়ে পার্কে বেড়াতে এসেছে। তোমার কাছে দৃশ্যটি মনে হয়েছিল অসাধারণ! তোমার খুব শখ হলো ৬ বাচ্চার। কি এখনো কি সেই শখ আছে? আমাদের সাড়ে তিন বছরের কাটুস পিটিস তো ৬ বাচ্চার সমান আমাদের ভরিয়ে রেখেছে। তাই না? তুমি তো থাকো না, সেদিন কি হয়েছে জানো, আমার খুব মন খারাপ, চুপচাপ বিছানায় শুয়েছিলাম। হঠাত্ দেখি আমার কপালে একটা ঠাণ্ডা হাত। চোখ খুলে দেখি তোমার মেয়ে। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আম্মু তোমার কি মাথা ব্যথা করছে?
আমি বললাম, হ্যা, মা, সঙ্গে সঙ্গে উল্কা বেগে সে ছুটে যেয়ে আবার ফিরে এলো আঙ্গুলে করে ভেসলিন নিয়ে। আমার কপালে মেখে সে কপাল টিপে দিতে থাকলো। সে ভেবেছে, ভেসলিনই বুঝি মাথা ব্যথার ভিক্স। আরেকদিন কি হয়েছে শোনো, আমি শুয়ে শুয়ে কাদছিলাম। মেয়ে আমার দৌড়ে এসে তার ছোট্ট বুকে আমার মাথাটা চেপে ধরে বসে থাকলো, তার জামা দিয়ে আমার চোখের পানি মুছিয়ে দিল। জানো সেদিন আমার কি মনে হচ্ছিল? ছোট বেলায় আমি যখন কাদতাম আমার মা তখন আমাকে এভাবেই বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতো। আমার মেয়ে সত্যিই আমার মা। আমার আদরের ছোট্ট মা।
কি খুব হিংসে হচ্ছে তাই না? মেয়ের সব আদর পেয়ে গেলাম বলে। তাহলে আরেকটা ঘটনা বলি, তুমি তখন ইনডিয়া যেয়ে একটা বিপদে পড়েছিলে। আমরা বাসায় বলাবলি করায়, তোমার মেয়ে ব্যাপারটা আচ করতে পেরেছিল। একদিন সকাল বেলা দেখি, সে তার ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটা কয়েন নিয়ে একজন অন্ধ ফকিরকে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি নিয়তে দিলে মা?
উত্তর দিয়েছিল, বাবার জন্য।
কি এখন নিশ্চয়ই খুশিতে তোমার চোখে পানি এসে গিয়েছে?
আমার সব সময় কি মনে হয় জানো, আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ দিয়েছে আমাদের মেয়েকে। আমার এই ছোট্ট কাটুস পিটিস আছে বলেই তোমাকে কাছে না পাওয়ার দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আমি অনেকটাই ভুলতে পারি। আজ এই ভালোবাসা দিবসে তাই আমি মন ভরে দোয়া করি আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ ভালোবাসা আমাদের মেয়েকে। আল্লাহ তার হৃদয়কে ভরিয়ে দিক সুখ, শান্তি এবং ভালোবাসায়। আর সব শেষে বলি আমি অসম্ভব ভালোবাসি তোমাকে এবং তোমার মেয়েকে।
কাটুস পিটিসের মা
মিরপুর, ঢাকা থেকে

প্রপার গাইড

আমাদের ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে কয়েকজন ছিল খুবই প্রেমকাতুরে। এইট-নাইনে পড়ার সময়ই, ব্যাচে পড়তে আসা জেলা স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করতো। তাদের কাণ্ড দেখে টিফিনের সময় আমরা আলোচনা ও হাসাহাসি করতাম। সেনসেটিভ এ বিষয়গুলো অনেক সময় ম্যাডামদের কানে যেতো। তারা প্রশ্ন করলে, মেয়েরা অস্বীকার করতো।
আমাদের করোনেশন গার্লস স্কুল খুলনা শহরের সবচেয়ে নামকরা। স্কুলের নামের প্রতি সুবিচার করার জন্য ম্যাডামরা রেজাল্ট ভালো করার বিষয়ে, পড়ালেখায় সিরিয়াস হতে পরামর্শ দিতেন। পড়ালেখায় আমাদের বান্ধবীদের তুমুল প্রতিযোগিতা ছিল। আমাদের সহপাঠী ছাত্রীদের মাঝে কাজি সাথী, কে কে শায়লা, মুনমুন জোয়ার্দার ঝরা, নিফফার শায়লা সুহিন, আরশি, পোর্শিয়া, বন্যা, শাহপার আমিন মিতু, মিলি, তপা, জেসবা, ডোরা, বনানী আফসানা, রিফাত ফাতেমা, রাফাত মুসলেমিন, রাফিয়া আফরোজা তুলি, মুক্তা, ঊর্মি, রেশমা, ঝুমা - এদের ভালো ছাত্রী হিসেবে সুনাম ছিল। আমরা চেষ্টা করতাম সিনিয়র আপুদের মতো এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট করার। রুমনী আপু, নিম্মি আপু, বাবনী আপু তাই ফেভারিট ছিলেন।
আমরা ক্লাস এইটের জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। আমাদের আলাদা ক্লাস হতো। যারা বৃত্তি দেয়ার জন্য সিলেক্টেড হয়নি, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে চাইতাম।
এর মধ্যে একটা ঘটনায় বড় ধাক্কা খেলাম। আমাদের সিনিয়র এক আপু মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি এক ছেলের প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেম গভীর ছিল। এতো ভালো একজন ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারলেন না। ইয়ার লস হলো। এ অবস্থা দেখে আমরা কি যে কষ্ট পেয়েছি। বান্ধবীরা আলোচনা করতাম, প্রেম কি এমন মহার্ঘ বস্তু? হৃদয়ের কোথায় কিভাবে আঘাত করলো, যার ফলে তার এ দশা হলো?
আমরা পরে মেডিকাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করে উচ্চ শিক্ষিত হয়েছি। এ পর্যায়ে যারা প্রেমে পড়েছে তারা বিশেষণ করে মানবীয় সম্পর্ক বিষয়ে। তবে অল্প বয়সে প্রেমে পড়া দুঃখজনক। কারণ দিকভ্রান্ত হওয়ার সমূহসম্ভাবনা থাকে। আমাদের অভিভাবক, স্কুলের স্যার ও ম্যাডামদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের প্রপার গাইড করার জন্য।
নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাবা মা

আমি আমার সেই ভালোবাসার মানুষগুলোর কথা বলবো, যাদের ছাড়া আমি নিঃস্ব, যারা আমার সবকিছু, যাদের ভালোবাসা পেয়ে আমি বড় হয়েছি তারা হলেন আমার বাবা-মা।
জানি না কতো বড় ভাগ্যবান হলে আমার বাবা-মায়ের সন্তান হওয়া যায়। আমার মা পৃথিবীর তিনজন শ্রেষ্ঠ মায়ের একজন। যিনি সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন শুধু মেয়ের মুখের একটু হাসির জন্য, যিনি সারা রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিতে পারেন মেয়েকে উৎসাহ দেয়ার জন্য, তিনি আমার মা যে কি না মেয়ের একটু জ্বর হলে সারা রাত চোখের পানি ফেলে রাত পার করেন মেয়ের মাথায় হাত রেখে।
আর আমার বাবা হলেন সেই মানুষ যিনি নিজের কাপড় কিনে, নিজের ডাক্তার দেখিয়ে টাকা খরচ করতে নারাজ অথচ মেয়ের মুখের একটা কথা রাখতে হাজার হাজার টাকা হাসিমুখে খরচ করতে দ্বিধা করেন না। আমি সত্যিই গর্বিত এমন বাবা-মায়ের সন্তান হতে পেরে। আমার সবচেয়ে গর্বের বিষয় হলো, আমি আদর্শ বাবা-মায়ের সন্তান। যারা দেশ গড়ার কারিগর। আব্বা-আম্মা আমি তোমাদের প্রচণ্ড ভালোবাসি।
সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে